Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লামিয়া তাসনিম

রোলঃ 227020867

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লামিয়া তাসনিম
রোলঃ 227020867

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ------ , আইডিঃ ------- বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

লামিয়া তাসনিম

আইডিঃ 227020867

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

নবী-রাসূলগনের স্মৃতিবিজড়িত ফিলিস্তিন 7

বায়তুল মাকদিসের সূচনা ও নির্মাণ 10

বায়তুল মাকদিসের গুরুত্ব 14

ফিলিস্তিনে মুসলিমদের শাসন 18

শিয়া শাসনামলে ফিলিস্তিন 21

ক্রুসেডারদের কবলে ফিলিস্তিন 22

ফিলিস্তিনে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রঃ) এর শাসন 23

ফিলিস্তিনের পতনের সূচনা 26

ব্যালফোর ঘোষনা ও ইসরাইল রাষ্ট্রের সূচনার কথা 28

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 30

ফিলিস্তিনিদের বর্তমান অবস্থা, আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম 32

তুফানুল আকসা 34

কুফরি বিশ্ব এবং জাতিসংঘের ভূমিকা 37

মুসলিম বিশ্ব এবং ওআইসি এর ভূমিকা 40

ফিলিস্তিন সংকটে মুসলিমদের করণীয় 43

উপসংহার 48

তথ্যসূত্র 49

ভূমিকা

অজস্র নবি রাসূলের স্মৃতিচিহ্ন জড়িত, দীর্ঘকালের ওহি নাজিলের স্বাক্ষ্য বহনকারী, মেরাজের রাতে সকল আম্বিয়াগণকে নিয়ে রাসূল (সা:) এর নামাজের ইমামতির পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন। এখানে অবস্থিত মাসজিদুল আকসা মুসলিমদের প্রথম কিবলা। এ স্থান থেকেই রাসূল (সাঃ) মেরাজের রাত্রিতে উর্ধ্বাকাশে গমন করেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰي بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَي الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

" পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চই তিনি (আল্লাহ) সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। – "সূরা বনী ইসরাইল **১৭**

স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ ভূমিকে বরকতময় ভূমির মর্যাদা দিয়েছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র।

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে মাসজিদুল আকসা ও ফিলিস্তিনের বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গুরুত্ব ও মর্যাদার দিক থেকে মাসজিদুল আকসার অবস্থান তৃতীয়। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) বায়তুল মাকদিসে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। এছাড়াও রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "ইবাদতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে চাইলে তিনটি মসজিদেই ভ্রমণ করা যাবে। মসজিদুল হারাম, আমার এ মসজিদ(মসজিদে নববী) ও মসজিদুল আকসা।" -বুখারি, হাদিসঃ**১১৮৯**।

ফিলিস্তিনে হিযরতকারী প্রথম আম্বিয়া হযরত ইব্রাহীম আঃ। তার পুত্র হযরত ইসহাক আঃ ও পরবর্তী প্রজন্মের বসবাসের সূত্র ধরে 'বনি ইসরাইল' জাতির জন্ম। হযরত ইউসুফ আঃ এর সময়ে বনি ইসরাইল মিশরে যায়। অতঃপর কয়েক শতাব্দী পর আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা আঃ এর মাধ্যমে তাদেরকে ফেরাউনের দাসত্বের কবল থেকে উদ্ধার করে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে ফিরিয়ে আনতে চাইলে, বনি ইসরাইলের অবাধ্যতার কারণে তারা আল্লাহর শাস্তিতে পতিত হয়। ৪০ বছর পর আল্লাহ তায়ালা আবারও ফিলিস্তিনের ভূমিতে বনি ইসরাইলকে ফিরিয়ে দেন। হযরত তালুত, হযরত দাউদ আঃ, হযরত সুলাইমান আঃ এর শাসন, বনি ইসরাইলের বিতাড়িত হওয়ার দ্বারা মুশরিক জাতিগুলোর এ ভূমি দখল অতঃপর মুসলিমদের পুনর্দখল এবং এ জাতির নিকট যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহর সতর্কবাণী পৌঁছানোর পরেও তাদের বারবার অবাধ্যতা, বিতাড়নের ইতিহাস বস্তুত শত শত বছরের!

পূর্ববর্তী উম্মতে মুসলিমার কেন্দ্রভূমি থেকে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য নির্বাচিত এ পূণ্যময় ভূমি আজকে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ইহুদিদের অবৈধ দখলদারিত্বের শিকার। তাদের অত্যাচার আর জুলুমে পিষ্ট ফিলিস্তিনের মুসলিম ভাই বোনেরা। যেখানে গনহত্যা এক নৈমিত্তিক ব্যাপার। মুসলিমদের ঘর-বাড়ি, হাসপাতাল, আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে আক্রমণ করে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে, এখনো হচ্ছে ! হাজার হাজার মুসলিম নারী, পুরুষ, শিশুদের শহীদ করা হচ্ছে। মুসলিম মা-বোনদের সম্মানহানি করা হচ্ছে। বিশ্ববাসীও যেন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে অসহায় ফিলিস্তিনী মুসলিমদের এ পরিণতিতে। কারণ ফিলিস্তিনীদের প্রতি এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়, তারা আজন্মই এই নিপীড়নের শিকার।

ফিলিস্তিনী মুসলিমদের তথা সমগ্র মুসলিম জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে আজকের কুফরি বিশ্বব্যবস্থার কোথাও নেই মানবাধিকারের কোনো বাস্তব প্রয়োগ। ইহুদীদের এ ইনসাফবিরোধী নির্যাতন আর নিরীহ মুসলিমদের রক্ত দেখে আমাদের অন্তরে এই অনুভূতি জাগ্রত থাকা খুবই জরুরী যে সর্বাবস্থায় সাধ্যমতো নিজ অবস্থান থেকে তাদের পাশে থাকবো, আমাদের দুয়ায় সর্বদাই ফিলিস্তিনী ভাই বোনদের স্মরণে রাখবো, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবো এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রাখবো।

একজন মুসলিম হিসেবে এটা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

নবী-রাসূলগনের স্মৃতিবিজড়িত ফিলিস্তিন

ফিলিস্তিনে বসবাসকারী সর্বপ্রথম সম্প্রদায় হলো কেনআনি সম্প্রদায়। এদের আদিনিবাস ছিল আরব উপদ্বীপ। সেখান থেকেই ফিলিস্তিনে এসে বসবাস করতে শুরু করে এ সম্প্রদায়। তাদের স্মৃতিচিহ্ন এখনো সেখানে বিদ্যমান।

হযরত ইবরাহীম আঃ

হযরত ইবরাহীম আঃ ফিলিস্তিনে হিজরত করেন ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। হযরত নূহ আঃ এর মহাপ্লাবনের পরে তাওহীদের সূচনা পুনরায় ঘটে হযরত ইবরাহীম আঃ এর মাধ্যমে। তিনি এ ভূমিতে বায়তুল মাকদিস নির্মাণ করেন, তবে কোনো কোনো সূত্রে এসেছে কেনআনিরাই বায়তুল মাকদিসের প্রতিষ্ঠাত।

পুত্র ইসহাক আঃ ও তার উত্তরসূরীরাই বংশ পরম্পরায় ফিলিস্তিনে তাওহীদের প্রসার ঘটান।

হযরত ইয়াকুব আঃ

ইয়াকুব (আ.)-এর আরেক নাম ইসরাইল আঃ। তিনি ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। তার বংশধরদের নামই বনি ইসরাইল। সম্রাট আহমোস ফিলিস্তিনে হামলা করলে তৎকালীন ফিলিস্তিনি শাসক হেকসোস তার কাছে পরাজিত হয়। সে সময় বনি ইসরাইলরা প্রচন্ড অত্যাচারের শিকার হয়। পরবর্তীতে বনি ইসরাইলের চরম অধঃপতন ঘটে এবং তারা শিরকে লিপ্ত হয়।

হযরত লূত আঃ

আল্লাহ তায়ালা কওমে লূত এর হাত থেকে উদ্ধার করে হযরত লূত (আঃ) কে ফিলিস্তিন ভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَي الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ

আর আমি তাকে এবং লূতকে উদ্ধার করে সে দেশে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রেখেছি। (সূরা আম্বিয়াঃ৭১)

বেশিরভাগ ব্যাখ্যায় এসেছে, এই আয়াতে ‘সেই দেশ’ বলে শাম দেশকে বুঝানো হয়েছে। যা বর্তমানে সিরিয়া এবং ফিলিস্তিনের ভূমি।

হযরত মুসা আঃ

বিভিন্ন শাসকদের অত্যাচারে বনি ইসরাইল একসময়ে মিশরে গমন করেন সেখানে ছিল হযরত মুসা আঃ। বনি ইসরাইলিরা মুসা (আ.) এর সাথে যে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে তার বর্ণনা আমরা কুরআনে বেশ অনেক জায়গায় দেখতে পাই। হজরত মুসা (আ.) খ্রিষ্টপূর্ব ১২৫০ এর কাছাকাছি

সময়ে বনি ইসরাইলকে নিয়ে ফিলিস্তিনে রওয়ানা হন। তবে সেখানে প্রবেশেও বনি ইসরাইল অসম্মতি জানায়। তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নির্ধারিত হয় যে তারা মরুভূমিতে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে এবং ৪০ বছর পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে না। এ শাস্তির সময়সীমা চলাকালীন সময়েই হযরত মুসা আঃ মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত ইউশা বিন নুন আঃ

খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ শতাব্দী তে বনি ইসরাইলদের নিয়ে ফিলিস্তিন জয় করেন নবী ইউশা আঃ এবং সেখানে প্রবেশ করে। ইউশা (আ.) তাদের নিয়ে সেখানেই বসবাস শুরু করে। তার জীবদ্দশায়ই বনি ইসরাইল অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তার মৃত্যুর পর চরম অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় এ জাতি।

হযরত দাউদ আঃ

খ্রিষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীর শেষে সেনাপতি তালুত বনি ইসরাইলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। তখন ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে এক ভয়াবহ যুদ্ধে হজরত দাউদ (আ.) জালুতকে হত্যা করেন। এ বিজয়ের পরে ফিলিস্তিনে এক স্বর্ণযুগের সূচনা ঘটে। বাদশাহ তালুতের মৃত্যুর পরে হযরত দাউদ (আ.) বনি ইসরাইলের নেতৃত্ব দেন এবং ফিলিস্তিনে সবচেয়ে বড় ইহুদিবাদি রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। তিনি ৪০ বছর ফিলিস্তিন শাসন করেন। তিনি ছিলেন একজন ন্যায়বিচারক। আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ আঃ কে আসমানী কিতাব যাবুর দান করেছিলেন।

হযরত সুলাইমান আঃ

দাউদ আঃ এর মৃত্যুর পরে তার পুত্র হজরত সুলায়মান (আ.) বনি ইসরাইলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বেশ দাপটের সাথে শক্ত হাতে তার শাসন কার্য পরিচালনা করেন। তিনি জীনদের দ্বারা বাইতুল মাকদিসকে সংস্কার করেন। সুলায়মান (আ.)-এর ইন্তেকালের পরে বনি ইসরাইলের ১২টি গোত্র তার দুই ছেলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এক জন নেতৃত্ব দেন ১০টি গোত্রের এবং অপরজন নেতৃত্ব দেন বাকি ২ গোত্রের। ১০ গোত্র ফিলিস্তিনের উত্তরে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে যার নাম ছিল 'ইসরাইল' আর ২ গোত্র ফিলিস্তিনের দক্ষিণে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে যার নাম ছিল ইয়াহুদিয়া বা জুডিয়া। বিশৃঙ্খলা ও একগুঁয়েমিতে ছিল উভয় গোত্রই বরাবর ফলে পাপাচারে উত্তপ্ত হয়ে উঠে তখনকার ফিলিস্তিন।

৫৮৬ খ্রিস্টপূর্বে ইরাকের সেনাপতি বুখতে নসর ফিলিস্তিনে যে তান্ডবলীলা চালায় তারমধ্যে দিয়ে অবসান ঘটে ইহুদি সাম্রাজ্যের যার প্রায় পুরোটাই ছিল ফিতনাময় ও ফ্যাসাদের।

খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ সালে পারসিকরা ফিলিস্তিন দখল করে এবং দীর্ঘ ২০০ বছরের ও বেশি সময় ধরে শাসন করে।

২০০ বছর পরে রোমান সেনাপতি আলেকজান্ডার ফিলিস্তিন আক্রমন করে ও দখল নেয়।

হযরত ঈসা আঃ

রোমান শাসনামলে ঈসা আঃ জন্মগ্রহন করেন ফিলিস্তিনের বায়তুল লাহাম শহরে। তার জন্মের পর থেকে পরবর্তী ৩০০ বছর ফিলিস্তিনে খ্রিস্টধর্মের তেমন কোন প্রসার ঘটেনি। ৩২৪ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিস্টধর্ম গ্রহন করে এবং এরপরই এ ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তবে পৌত্তলিকদের বিকৃত চিন্তা-ভাবনার প্রভাবে খ্রিস্টধর্ম বিকৃতরূপে রোমান সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

তার বিরুদ্ধে ইহুদীদের আনা কুফরির মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে শূলে চড়ানো হয়েছে বলে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে উর্ধ্বাকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে তিনি আবারও আল্লাহর নির্দেশে দুনিয়াতে আসবেন। এবং এখানেই ‘বাবে লূদ’ এলাকায় হযরত ঈসা আঃ দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

বায়তুল মাকদিসের সূচনা ও নির্মাণ

এই ফিলিস্তিনেই রয়েছে কুদসের ভূমি, আকসার ভূমি। মক্কার মসজিদুল হারাম ও মদীনার মাসজিদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর বাইতুল মাকদিস হল তৃতীয় বিশেষ মসজিদ। বায়তুল মাকদিসের সূচনা ও নির্মাণের ঘটনাপ্রবাহ হাজার বছর ধরে দুনিয়ার বুকে তাওহীদের বিস্তার ঘটার সময়গুলোর নীরব স্বাক্ষী।

বায়তুল মাকদিসের সূচনাঃ

অনুমান করা হয়ে থাকে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে কেনআনিরা বায়তুল মাকদিস নির্মাণ করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে এখানে হযরত ইবরাহীম আঃ এসেছিলেন এবং তার বংশধরদের ক্রম পরম্পরায় এখানে বহু নবী রাসূলের আগমন ঘটে। এ সকল নবীদের পরিচর্যায় গড়ে উঠে মাসজিদুল আকসার ইতিহাস।

হাদিস শরিফ এ এসেছে মাসজিদুল হারাম নির্মানের ৪০ বছর পরে মাসজিদুল আকসা নির্মান করা হয়। হযরত ইয়াকুব আঃ এর হাতে এ মসজিদের পুনঃনির্মান হয়েবং তার ও হাজার বছর পরে দাউদ আঃ এর নির্মানকাজ শুরু করেন কেননা ইতিমধ্যে এ মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দাউদ আঃ এর ইন্তিকালের পরে তার ছেলে সুলাইমান আঃ এর নির্মানকাজ সম্পন্ন করেন।

সুলাইমান আঃ এর অনুগত জীনদের সাহায্যে এ মসজিদের নির্মান ও সংস্কার সম্পন্ন হয়। আল্লাহর নির্দেশে সুলাইমান আঃ তার কক্ষে ইবাদতরত অবস্থায় মৃত্যুবরন করলেও তার দেহ বিন্দুমাত্র পচেনি বা পড়ে যায়নি। তিনি লাঠিতে ভর দেয়া অবস্থাতেই মসজিদের সংস্কার শেষ হওয়া পর্যন্ত অক্ষত ছিলেন অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ঘুনপোকার মাধ্যমে তার মৃত্যুর বিষয়টি জীনদের অবহিত করলেন। এভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় মসজিদুল আকসার নির্মাণকাজ শেষ হয়।

৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমানদের আক্রমনে জেরুজালেম পুরাপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। সুলাইমান আঃ এর নির্মানের পরেও আরো বেশ কিছুবার এখানে মসজিদকে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। কখনো ভূমিকম্প কখনো বিভিন্ন শত্রুর আক্রমনের ফলে মূল স্থাপনা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পুনর্নির্মান করতে হয়েছে। এ কাজ কখনো ইহুদিরা করেছে আবার কখনো মুসলিমরা করেছে। কোনো সময় এমনও গিয়েছে যখন এখানে শুধুই ধ্বংসস্তুপ ছিল।

খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের সমস্ত ফিলিস্তিন দখলের মধ্যে দিয়ে বায়তুল মাকদিসের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা নামধারী মুসলিম শাসকদের সহায়তায় সমগ্র সিরিয়া ও ফিলিস্তিন দখল করে। এরপর তারা বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করে এবং মসজিদটিকে গির্জায় পরিণত করে। এছাড়াও স্টোররুম, সৈন্যদের কোয়ার্টার এবং ঘোড়ার আস্তাবল হিসেবেও তারা এ পবিত্র মসজিদকে ব্যবহার করে। এ ঘটনা ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঘটে।

প্রায় ৯০ বছর মুসলিমদের থেকে বেদখল থাকার পর ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে হিত্তিনের যুদ্ধে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি (রহ) খ্রিস্টানদের পরাজিত করে বায়তুল মাকদিস স্বাধীন করেন।
উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের যুগে মসজিদটি পুনর্নির্মিত ও সম্প্রসারিত হয়। ভূমিকম্পে মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর এটি পুনর্নির্মাণ করেন। পরে তার উত্তরসুরি আল মাহদিও এর পুনর্নির্মাণ করেন। ১০৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ভূমিকম্পে মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে খলিফা আলি জাহির পুনরায় মসজিদটি নির্মাণ করেন যা বর্তমান অবধি টিকে রয়েছে। বিভিন্ন শাসকের সময় মসজিদটিতে অতিরিক্ত অংশ যোগ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে গম্বুজ, আঙ্গিনা, মিম্বর, মিহরাব, অভ্যন্তরীণ কাঠামো।

মসজিদুল আকসার নির্মানশৈলীঃ

মূল মসজিদের স্থাপনাটির আয়তন ৪২ হাজার বর্গগজ। এর অভ্যন্তরীণ ও বহির্ভাগ অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ তৈরী করা হয়েছে। মূল্যবান মার্বেল পাথর,স্বর্ণ,সীসা ব্যবহৃত হয়েছে এর নির্মানে এবং কারুকার্যময় টালিস্তম্ভ দিয়ে মিহরাব ও গম্বুজগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদে ২টি বড় এবং ১০টি ছোট গম্বুজ রয়েছে। বর্তমানে 'আল-আকসা' মসজিদ বলতে বোঝায় কিবলি মসজিদ, মারওয়ানি মসজিদ ও বুরাক মসজিদ এ তিন মসজিদকে। এ তিনটির সমন্বয়কে বলা হয় 'হারাম আশ শরিফ' যা এর চার দেয়ালের মধ্যেই অবস্থিত। হারাম আশ শরিফ হলো- মসজিদে আকসার সঙ্গে একই প্রাঙ্গণে কুব্বাতুস সাখরা, কুব্বাতুস সিলসিলা ও কুব্বাতুন নবী নামক স্থাপনাগুলো। মসজিদে প্রবেশের দরজা পূর্বে ১৪টি ছিল তবে নিরাপত্তাজনিত কারনে ৪টি দরজা বন্ধ করে দেয়ার এখন ১০টি দরজা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যে ভিত্তির উপর মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল এখনোও সেই ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পাঁচ হাজার মুসলিম একত্রে এ মসজিদে নামাজ আদায় করতে পারে।

মসজিদ কম্পাউন্ডঃ

মসজিদের কিবলার দিকের দেয়ালে "মিহরাবে দাউদ" নামে একটি মিহরাব আছে। এর সাথে একটি ঐতিহাসিক মিম্বার ছিল যেটি বিশেষভাবে এ মিহরাবের পাশে স্থাপনের জন্য তৈরী করা হয়েছিল। তবে ইহুদিদের হামলায় এর অধিকাংশই এখন ক্ষতিগ্রস্ত।
পশ্চিমে একটি লোহার কুঠুরি রয়েছে এবং এর পাশেই আছে "মিহরাবে মুয়াবিয়া" নামে এক মিহরাব। পূর্বদিকের লম্বাকৃতির অংশটি মূলত উমর রাঃ কর্তৃক নির্মিত সেই প্রাচীন অংশ যাকে "জামে উমর" বলা হয়। এর উত্তরে রয়েছে "উজায়ের গ্যালারি" এবং এ গ্যালারির উত্তর দিকে আছে "মিহরাবে জাকারিয়া" নামক ছোট একটি মিহরাব।

মাদরাসাসমূহঃ

উত্তর-পশ্চিম দিকের পাঁচিলের সাথে একটি প্রশস্ত বারান্দা আছে যার আন্ডারগ্রাউন্ড ও উপরের অংশে শ্রেণিকক্ষ ও ছাত্রদের থাকার স্থান। এখানে রয়েছে প্রসিদ্ধ কিছু মাদরাসা এবং ছোট কিছু পাঠাগার।

গম্বুজসমূহঃ

বায়তুল মাকদিসের শোভা বর্ধনকারী এ গম্বুজগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল জ্ঞানচর্চা ,আল্লাহর ইবাদত আর ঐতিহাসিক স্মারক হিসেবে। এখানে প্রসিদ্ধ একটি গম্বুজ রয়েছে "মিরাজ গম্বুজ" এটি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর মিরাজের স্মারক হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। তাছাড়াও কুব্বাতুস সিলসিলা, কুব্বাতুস নাহবিয়া ,ইউসুফ গম্বুজ এগুলো এ স্থ্যানের প্রসিদ্ধ কিছু গম্বুজ।

চত্বরসমূহঃ

নামাজ আদায় আর জ্ঞানচর্চার অংশ হিসেবে নির্মিত এ চত্বরগুলোর বেশিরভাগ পূর্বদিকের আঙিনায় অবস্থিত। বেশিরভাগ চত্বরই উসমানি খিলাফতকালে নির্মান করা হয়েছিল। এরকম মোট ২৪টি চত্বর আছে। প্রসিদ্ধ কিছু হলো কর্কের চত্বর,সুলতান জাহিরের চত্বর প্রমুখ।

সূর্যঘড়ি ও আন্ডারগ্রাউন্ডঃ

নামাজের সঠিক সময় নির্ণয়ের সুবিধার্থে বায়তুল মাকদিসে ২টি সূর্যঘড়ি ছিল। আর মসজিদের মূল হলের নিচে মাটির নিচে একটি বড় কক্ষ ছিল, একে পুরাতন মসজিদে আকসাও বলা হয়। খ্রিস্টান শাসনামলে এ কক্ষটি ঘোড়া বাঁধার কাজে ব্যবহৃত হতো।

কুব্বাতুস সাখরাঃ

মূল মসজিদ কাঠামো থেকে ৫০০ মিটার দূরে একটি উঁচু চত্বরে উপর এটি নির্মিত। কুব্বাহ অর্থ গম্বুজ এবং সাখরা অর্থ পাথর। গম্বুজটি কুদরতি একটি পাথরের উপর নির্মিত বলে একে কুব্বাতুস সাখরা বলা হয়। এ স্থাপনার দেয়ালের বাইরে চারদিকে পাথরের উপর অতি মনোমুগ্ধকর লিপিতে 'সূরা বনি ইসরাইল' এবং 'সূরা ইয়াসীন' লিপিবদ্ধ আছে। হাদিসের বর্ননামতে এ পাথরের উপর ভর করেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উর্ধ্বারোহণ করেছিলেন মিরাজের রাত্রিতে।

বুরাক দেয়ালঃ

ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমির দক্ষিন-পশ্চিম কোণে অবস্থিত এ দেয়ালটি অবস্থিত। এ দেয়ালটির পাশে মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের বাহন বেঁধেছিলেন।

তাই এর নামকরন করা হয়েছে ‘বুরাক দেয়াল’। মুসলিমরা এ দেয়ালের সাথে ‘মসজিদে বুরাক’ নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ইহুদিরা এ পবিত্র ভূমিকে দখল করার পর মুসলিমদের বিভিন্ন স্মৃতিবিজড়িত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংস করে ফেলে। বিভিন্ন স্থাপনার সাথে এ মসজিদটিও ধ্বংস করে ফেলা হয়। বর্তমানে তারা এ দেয়ালকে “কান্নার দেয়াল” নামে নামকরণ করেছে।

বায়তুল মাকদিসের গুরুত্ব

বায়তুল মাকদিস বা মসজিদুল আকসা ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থাপনা। মানবজাতির প্রথম কিবলা কাবা শরীফ হলেও বায়তুল মাকদিস নির্মাণের পর এটিই কিবলা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদের নিয়ে ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রায় ১৭ মাস মসজিদুল আকসার দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছিলেন। তাই মুসলিমদের প্রথম কিবলা বলেও পরিচিত এ পবিত্র মসজিদটি।

মিরাজের স্মৃতিবিজড়িত মসজিদঃ

বায়তুল মাকদিসের গুরুত্ব বোঝার জন্য এই যথেষ্ট যে এই স্থান থেকেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উর্ধ্বারোহণ করেন এবং সকল আম্বিয়াগনকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন এবং তাদের ইমামতি করেছেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

“অতঃপর আমি বাইতুল মাকদিসে প্রবেশ করলাম। সমস্ত নবীদেরকে একত্রিত করা হল। জিবরীল আমাকে সামনে এগিয়ে দিলেন আর আমি তাঁদের ইমামতি করলাম।”- সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ৪৪৯।

বরকতময় মসজিদঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশ্রোতা” - সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ১

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন -

“আমি ওদের এবং যে জনপদগুলোতে বরকত রেখেছি, তার মাঝে এমন সব জনপদ স্থাপন করেছিলাম, যা নজরে আসত...।” - সূরা সাবা (৩৪) : ১৮

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এখানে বরকতময় জনপদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল বাইতুল মাকদিসের জনপদ। - তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৬, পৃ. ৪৬৮

আল্লাহ তায়ালা এই মসজিদকে এবং এর আশেপাশের জনপদকেও বরকতময় করেছেন। এটি একটি বিশেষ ফজীলত এ স্থানের।

দ্বিতীয় প্রাচীন মসজিদঃ

হাদিসে আবু যর রাঃ থেকে বর্ণিত, "আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদুল হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোন মসজিদ? তিনি বললেন, মসজিদুল আকসা। বললাম, এই দুইয়ের নির্মাণের মাঝে কত সময়ের ব্যবধান? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং ৩৩৬৬)

অর্থাৎ মসজিদুল হারামের পরেই এই মসজিদের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল এবং সে বিবেচনায় এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম মসজিদ।

মর্যাদার দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানঃ

ইসলামে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মসজিদের তালিকায় বায়তুল মাকদিস তৃতীয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সফর করলে তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা উচিত। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা।" - সহীহ বুখারি, হাদীস নং **১১৮৯**।

এই হাদিস থেকেই স্পষ্ট হয় যে মসজিদে হারাম ও নববীর পরেই মর্যাদায় মসজিদে আকসার অবস্থান।

মুসলিমদের প্রথম কিবলাঃ

বায়তুল মাকদিসের অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এটি মুসলিমদের প্রথম কিবলা ছিল। মক্কায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা কে সামনে রেখে বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। হিজরতের পর মদীনায় ও ষোল মাস এদিকে ফিরেই সালাত আদায় করেন তিনি। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা কিবলা পরিবর্তন করেন।

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. বলেন, "নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথম মদীনায় এলেন, তাঁর মামাদের বাড়িতে মেহমান হলেন। আর তিনি বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে **১৬** থেকে **১৭** মাস পর্যন্ত নামায আদায় করেছেন। তবে তিনি চাইতেন বাইতুল্লাহ যেন তাঁর কেবলা হয়...।" —সহীহ বুখারী, হাদীস ৪০।

বায়তুল মাকদিসে নামাজের ফজীলতঃ

এ মসজিদে নামাজ আদায়ের সওয়াব অন্যান্য মসজিদ থেকে অনেক গুণে বেশি।

আবু দারদা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "মসজিদে হারামের নামাজ এক লক্ষ নামাজের সমান। মসজিদে নববীতে নামাজ এক হাজার নামাজের সমান। আর বায়তুল মাকদিসের নামাজ পাঁচশত নামাজের সমান।" - শুআবুল ঈমান, বায়হাকী হাদিস ৩৮৪৫।

বায়তুল মাকদিস থেকে ইহরাম বাঁধার বিশেষ ফজীলতঃ

মসজিদুল হারাম এক পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত, আর মসজিদুল আকসারও আরেক পবিত্র ভূমিতে অবস্থান।

হাদিসে মসজিদুল আকসা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করার বিশেষ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "যে ব্যক্তি বায়তুল মাকদিস উমরাহ করার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধে, তার গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হবে" – সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩০০১।

হকপন্থীদের অবস্থানঃ

বায়তুল মাকদিসে এবং এর আশেপাশের এলাকায় সবসময় এমন এক জনগোষ্ঠী থাকবে যাদের অবস্থান হবে হকের উপর।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর অবিচল থাকবে।তাদের দুশমনের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।অবশেষে আল্লাহর নির্দেশ আসবে আর তারা এভাবেই থেকে যাবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, এই দলটির অবস্থান কোথায় হবে?

আল্লাহর রাসূল বললেন, বায়তুল মাকদিস এবং এর আশেপাশে।" - মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ২১২৮৬।

হাশরের ময়দানঃ

কিয়ামতের দিন এখানেই হবে হাশরের ময়দান। এ কারণেও বায়তুল মাকদিস একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান মুসলিমদের কাছে।

হযরত মায়মুনা রাঃ বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন এটি হবে হাশরের ময়দান। এখান থেকে মানুষ নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে যাবে। তোমরা এখানে আসো এবং নামাজ আদায় করো।" - মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদিস ৭০৮৮।

হক বাতিলের চূড়ান্ত লড়াইঃ

দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকেই হক বাতিলের লড়াই চলে আসছে। তবে এর চূড়ান্ত লড়াই হবে বায়তুল মাকদিসের অঞ্চলে।

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষন না মুসলিমরা ইহুদীদের সাথে লড়াই করবে এবং তাদেরকে হত্যা করবে। এমনকি ইহুদীরা যে পাথর বা গাছের পেছনে আত্মগোপন করবে সে পাথর বা গাছ ও বলে উঠবে, হে মুসলিম হে আল্লাহর বান্দা এইযে আমার পেছনে ইহুদী আছে। এসো তাকে হত্যা করো। তবে গারকাদ গাছ কিছু বলবে না কারন এটি ইহুদীদের গাছ।" - সহীহ বুখারি, ২৯২৬।

দাজ্জাল থেকে নিরাপদঃ

আল্লাহ তাআলা মসজিদুল আকসাকে দাজ্জালের হাত থেকে রক্ষা করবেন। হাদিসে এসেছে, ‘দাজ্জাল পৃথিবীতে ৪০ দিন অবস্থান করবে। তার রাজত্ব সর্বত্র বিস্তার লাভ করবে। তবে চার মসজিদ তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে। তা হলো কাবা, মসজিদে রাসুল, মসজিদুল আকসা ও মসজিদে তুর।’ (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৩১৩৯)

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো থেকেই ইসলামে বায়তুল মাকদিসের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে বায়তুল মাকদিসের সম্মান রক্ষা করার তাউফিক দিন।

ফিলিস্তিনে মুসলিমদের শাসন

মিরাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বায়তুল মাকদিসে আগমনের মধ্য দিয়ে ইসলামী যুগের সূচনা ঘটে। নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে প্রথম বাইয়াতে আকাবা ও দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবার মাঝামাঝি সময়ে ইসরা-মিরাজ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাঃ মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে তখনকার বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্যের যুদ্ধে পারসিকরা জয়ী হয়। তবে পুনরায় যুদ্ধে রোমানরাই জয়লাভ করে। আহযাব যুদ্ধের সময়ে আল্লাহর রাসূল সাঃ সাহাবীদেরকে ফিলিস্তিন জয়ের সুসংবাদ দেন।

অষ্টম হিজরীতে রাসূল সাঃ ফিলিস্তিন, দামেশক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসক এর কাছে ইসলাম গ্রহনের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠান। শাসক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূতকে হত্যা করে। এ প্রেক্ষিতে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় মনোযোগী ছিলেন। ওফাতের এক মাস আগেও তিনি উসামা ইবনে যায়েদ রা.-এর নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করছিলেন। ইতিমধ্যে নবীজীর ওফাতের কারণে এ বাহিনী অভিযানে বের হওয়া থেকে বিরত থাকে। আবু বকর রা. খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্তির পরে সর্বপ্রথম এ বাহিনীকে ফিলিস্তিন অভিমুখে অভিযানে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই অভিযান পূর্ণতা লাভের আগেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

মুসলিম শাসনামলের সূচনাঃ

ফিলিস্তিনে মুসলিম শাসনামলের সূচনা হয় ইসলামের প্রাথমিক যুগেই। এ সময়টুকু কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১/ খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে ফিলিস্তিনঃ

আবু বকর রাঃ এর পরে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন উমর রাঃ। উমর রা.-এর শাসনামলে হিজরী ১৬ সনের রবিউল আখির মাসে ইয়ারমুকের যুদ্ধে বিজয় লাভের মাধ্যমে গাজা, নাবলুস, লদ, ইয়াফা, রাফাহসহ কুদসের বিভিন্ন শহর মুসলমানদের হস্তগত হয়। আল কুদসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রোমান খ্রিস্টানরা। দীর্ঘ ৪ মাস অবরোধের পর মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.) বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হন। তখন জেরুজালেমের বিশপ সফরোনিয়াস উমর (রা.) কাছে কুদসের চাবি প্রদানের শর্তারোপ করেন। অতঃপর উমর (রা.) নিজে ফিলিস্তিনে আগমন করেন এবং খ্রিষ্টানদের সঙ্গে নিম্ন লিখিত দু'টি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনঃ

১ঃ খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন গির্জাঘর ও উপাসনালয় নিরাপত্তা পাবে।

২ঃ এই পবিত্র শহরে কোনো ইহুদি বসবাস করতে পারবে না।

সেই ঐতিহাসিক চুক্তিপত্র 'আহদিয়ায়ে উমরিয়্যাহ' নামে বিখ্যাত। চুক্তিনামাটি আলকুদসের কিয়ামাহ গির্জায় আজও সংরক্ষিত আছে।

আল কুদস বিজয়ের পর উমর রাঃ সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে সম্মানিত স্থাপনাগুলোকে পরিষ্কার করেন এবং বিজয়ী সাহবীদের কাফেলাকে সাথে নিয়ে নবীজীর বুরাক বাঁধার স্থানের পাশে নামাজ আদায় করেন। পরে তার নির্দেশে সেখানে কাঠ ও গাছের পাতা দিয়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

হজরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.) ছিলেন শামের প্রথম মুসলিম গভর্নর। তখন ফিলিস্তিন শামেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। হিজরী ১৮ সনে এক মহামারীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর গভর্ণর নিযুক্ত হন মুআয ইবনে জাবাল রাঃ। তার মৃত্যুর পর মুয়াবিয়া রাঃ গভর্ণর নিযুক্ত হন । ১৯ হিজরীতে মুয়ায়াবিয়া রাঃ এর হাতে কায়সারিয়া জয়ের মধ্য দিয়ে গোটা ফিলিস্তিন মুসলিমদের হাতে চলে আসে এবং দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। উসমান রাঃ এর পুরো শাসনামল জুড়েই হযরত মুয়াবিয়া রাঃ গভর্ণরের পদে ছিলেন। এ শাসনামলের শেষের দিকে ফিতনা ছড়িয়ে পড়তে থাকে ,যদিও শাম ও ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা এ ফিতনা থেকে বিরত ছিলেন বলেই জানা যায়।

২/ উমাইয়া খিলাফতের শাসনামলে ফিলিস্তিনঃ

ফিতনার এই সময়টাতে শাম, ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা মুয়াবিয়া রাঃ এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তার হাত ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয় উমাইয়া খেলাফত। হিজরী ৪১ থেকে ১৩২ সন পর্যন্ত এ শাসনামল স্থায়ী হয়েছিল। এ সময়টা ছিল ফিলিস্তিনে মুসলিমদের উন্নতি ও অগ্রগতির বসন্ত কাল। হিজরী ৭২ সনে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান নির্মাণ করেন অষ্টকোণাকৃতির ঐতিহাসিক স্থাপনা "কুব্বাতুস সাখরা"। হিজরী ১২৯ সনে ভূমিকম্পে মসজিদুল আকসার বিভিন্ন স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন উমাইয়া খলিফার নেতৃত্বে দ্রুত এর সংস্কার করা হয়। হিজরী ১৩২ সনে উমাইয়া খিলাফতের শাসনের অবসান ঘটে।

৩/ আব্বাসীয় খিলাফতের শাসনামলে ফিলিস্তিনঃ

উসমানী খিলাফতের শাসনের অবসানের পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় আব্বাসীয় খিলাফতের যুগ। ১৩২ হিজরি সন ২৪৭ হিজরি সন পর্যন্ত এই ১১৫ বছর ছিল আব্বাসীয় শাসনামলের স্বর্ণযুগ। আব্বাসী যুগে আল আকসার ঐতিহ্যের কার্যক্রম বেগবান হয়। খলিফা হারুনুর রশিদ ও তার ছেলে মাহদী মসজিদ পরিদর্শনে আসে। আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগনের সাথে এ অঞ্চলের তরুণ প্রজন্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে।

উমাইয়াদের মতো আব্বাসীরাও ফিলিস্তিনকে খুব গুরুত্ব দিত। তবে উমাইয়াদের পর্যায়ে হয়নি কারণ, উমাইয়াদের রাজধানী ছিল ফিলিস্তিনের কাছের অঞ্চল দামেশকে। আবার, আব্বাসীদের খিলাফতের রাজধানী ছিল বাগদাদে। ফলে দূরত্বের কারণে যত্নে কিছুটা ঘাটতি পড়েছিল।

আব্বাসী খেলাফতের দুর্বলতার কালে তৎকালীন গভর্নর আহমদ ইবনে তুলুন হিজরি ২৫৪ সনে আব্বাসী শাসন থেকে বেরিয়ে যান এবং স্বাধীন তুলুনী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। হিজরী ২৬৪ সনে তিনি ফিলিস্তিন অধিকার করেন। ফিলিস্তিন ৫৭ বছর তুলুনী রাজ্যের অধীনে ছিল। ইতিহাসে এ শাসনামলের বেশ সুনাম রয়েছে। হিজরী ৩২১ সনে তুলুন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

পরবর্তী ৩৮ বছর ইখশীদীরা ফিলিস্তিন শাসন করেন। এ আমল কেও ফিলিস্তিনের জন্য উত্তম শাসনামল বলে বিবেচনা করা হয়। ইখশীদী সুলতানদের কাছে ফিলিস্তিন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার ছিল যে, কোনো খলীফার ইন্তেকাল হলে তাকে মসজিদুল আকসায় দাফনের জন্য নেয়া হতো। এর গুরুত্ব দেয়ার পরও এ আমলে ফিলিস্তিনে সামরিক ও দাওয়াতী কার্যক্রম শিথিল হয়ে পড়ে। ৩৫৯ হিজরীতে ইখশীদীদের পতন ঘটে এবং এসব দুর্বলতা ধরা পড়ে।

ইখশীদীদের পতনের মধ্যে দিয়ে ফিলিস্তিনে আব্বাসি খিলাফতের অবসান ঘটে। তবে পরবর্তীতে আল্লাহর ইচ্ছায় আবারও এ পবিত্র ভূমিতে মুসলিমদের বিজয় আসে।

শিয়া শাসনামলে ফিলিস্তিন

আব্বাসীয় শাসনের দূর্বলতার সুযোগ কাজে লাগায় উবায়দিয়রা। তারা ছিল নিকৃষ্ট শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। ৩৫৯ হিজরীতে উবায়দিয়রা মিশর দখল করে এবং একই বছর তারা ফিলিস্তিন ও দখল করে। ফিলিস্তিনে এক অন্ধকার যুগের সূচনা ঘটে উবায়দিয়দের ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে। এ সময় ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান ও দাওয়াতি কার্যক্রম প্রায় শূণ্যের কোঠায় নেমে আসে। সুন্নি উলামায়ে কেরামকে হত্যা করা হয়। এর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে ফিলিস্তিন ও মিশরে।

উবায়দিয়রা টানা ১০৪ বছর ফিলিস্তিন শাসন করে। দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে শাসন ক্ষমতায় থাকা মুস্তানসির লিদীনিল্লাহ এর আমলে উবায়দিয়রা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মুস্তানসিরের আমলেই আফগানিস্তান ও ইরানে সালজুক সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। এরা ছিল আকদীগত দিক থেকে সুন্নী। ৪৬৩ হিজরীতে আতসিয ইবনে উবাক ফিলিস্তিন কে উবায়দিয়দের হাত থেকে মুক্ত করেন। তবে তিনি সালজুক সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার কারনে তাকে পরাজিত ও হত্যা করা হয় এবং ফিলিস্তিন শাসনের জন্য তার স্থলাভিষিক্ত করা হয় আরতুক নামক একজন সেনাপতিকে।

হিজরী ৪৭১-৪৮৯ সন এই ১৮ বছর আরতুক দায়িত্বে পালন করে। উবায়দিয়দের দীর্ঘ কঠোর দুঃশাসনের তুলনায় এই সময়টা ছিল খুবই অল্প তবে উত্তম এক সময়। কারন, আরতুক একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন।

৪৮৯ হিজরীতে উবায়দিয়দের মধ্যের এক ফিরকা আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। ক্ষমতা দখলের পর উবায়দিয়রা আবারও সেই পুরনো আগ্রাসন শুরু করে এবং সুন্নী আলেমদের হত্যায় মেতে উঠে।

অপরদিকে, ফিলিস্তিন থেকে বহিষ্কৃত আরতুক উত্তরসূরীরা তুরস্কে হিজরত করে সেখানে আরতুক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এদের বিশাল অবদান ছিল।

ক্রুসেডারদের কবলে ফিলিস্তিন

৪৯০ হিজরীতে উবায়দিয়দের উৎখাত করতে ফিলিস্তিনের দিকে ধেয়ে আসে ক্রুসেডাররা। ২য় পোপ ক্রুসেডারদের উদ্দেশ্যে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয় এবং সেখানে মুসলিমদের হাত থেকে মাসীহের সমাধি উদ্ধার করতে এবং আল কুদস কে পবিত্র করতে তাদেরকে উদাত্ত আহবান জানায়। পোপের এ ভাষণ তখন সারা ইউরোপে আগুন ধরিয়ে দেয়।

৪৯২ হিজরীতে ক্রুসেডাররা এসে আল কুদসে পৌঁছায়। অনবরত আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে জনগনের উপর। দীর্ঘ অবরোধের পরে, ক্রুসেডাররা আল কুদসের দখল নিয়ে নেয় এবং ঘোড়ায় চড়ে মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করে।

ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ এবং গণহত্যা শুরু হয় ফিলিস্তিন জুড়ে। ৭০ হাজার নিরীহ সাধারন মুসলিমকে নির্মমভাবে জবাই করে হত্যা করা হয়। নারী, পুরুষ ,শিশু,বৃদ্ধ কেউই এই হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পায়নি। পবিত্র শহরে রক্তের বন্যা বয়ে যায়। বর্ণনায় এসেছে, তখন এত মানুষ শহরজুড়ে হত্যা করা হয় যে, সৈনিকদের ঘোড়ার গোড়ালি পর্যন্ত রক্তে ডুবে গিয়েছিল।মসজিদ ও মুসলিমদের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপনা ধ্বংস করে সেগুলোকে গীর্জায় রূপান্তর করা হয়। মসজিদে আকসাকে ক্রুসেডাররা ঘোড়ার আস্তাবল হিসেবে ব্যবহার করে।

শুধু মুসলিম নয়, ইহুদিদের উপরেও অত্যাচার চালানো হয়। ইহুদিরা মসজিদুল আকসায় বা সিনাগগে আশ্রয় নিলেও সেখানে তাদেরকে একত্রিত করে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

ইতিমধ্যে মুসলিম বিশ্বে বেশকিছু ক্রুসেড রাজ্য গঠন হয়। ৫০৭ হিজরীতে মুসলিমদের সাথে এক যুদ্ধে ক্রুসেডাররা পরাজিত হয় এবং বীর ইমামুদ্দিন জেংকির আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনি একে কে মুসলিম বিশ্বে গজিয়ে উঠা ক্রুসেড রাজ্যগুলো জয় করতে থাকেন। আর এভাবেই জেংকি সাম্রাজ্য গড়ে উঠে। তার মৃত্যুর পর পুত্র নুরুদ্দীন জিংকি ফিলিস্তিন জয়ের এ মিশনের হাল ধরেন। তিনি ক্রুসেডারদের অনেকবার পরাজিত করেন এবং ক্রমান্বয়ে দামেশক এবং মিশর দখল করেন। উবায়দিয়রা বেশ কয়েকবার ক্রুসেডারদের সাথে হাত মিলিয়ে মিশর দখল করতে চাইলেও প্রতিবারই ব্যর্থ হয়।

নুরুদ্দীন জিংকি এর মৃত্যুর পর তরুণ সালাহউদ্দিন আইয়ুবী জিহাদের হাল ধরেন। মুসলিম রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে শক্তি সঞ্চয় করেন। হিজরী ৫৮৩ সনে হিত্তিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ক্রুসেডারদের সংখ্যা মুসলিম সৈন্যের সংখ্যার প্রায় পাঁচগুণ হলেও আল্লাহর সাহায্যে এ যুদ্ধে মুসলিমরাই বিজয় লাভ করে। হিত্তিনের যুদ্ধে বিজয় লাভের এক মাসের ও কম সময়ের মধ্যে একে একে শহরগুলো ক্রুসেডারদের দখলমুক্ত করতে থাকে। অতঃপর লেবানন গিয়ে সেখানকার বায়তুল মাকদিস রাজ্যের অধীনে থাকা শহরগুলো জয় করতে থাকেন। দুই মাসের মধ্যে আল কুদস ব্যতীত সম্পূর্ণ ফিলিস্তিন তিনি জয় করেন।

ফিলিস্তিনে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রঃ) এর শাসন

হিজরী ৫৮৩ সনে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আল কুদস অবরোধ করেন। তিনি শহরের পাদ্রীকে শান্তিপূর্ণভাবে শহর হস্তান্তরের প্রস্তাব দিলে পাদ্রী সেটি প্রত্যাখান করে। তাই সালাহউদ্দিন আইয়ুবী অবরোধ, আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। ১২ দিনের অবরোধ শেষে আল কুদসের নিয়ন্ত্রণ মুসলিমদের হাতে আসে।

ক্রুসেডাররা আল আকসা কে তিন ভাগে ভাগ করে ব্যবহার করতো। এক ভাগে ছিল গীর্জাঘর, দ্বিতীয় ভাগে ছিল সৈন্যদের থাকার জায়গা এবং অপরভাগে ছিল ঘোড়ার আস্তাবল। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সৈন্যদল মসজিদে প্রবেশ করে এবং মসজিদটি এক সপ্তাহ যাবত পরিষ্কার করে। অতঃপর তারা সকলেই একত্রে মসজিদুল আকসায় শুকরিয়ার সালাত আদায় করে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সে বছর আল কুদসে ঈদুল আযহা উদযাপন করেন।

৫৮৫ হিজরীতে ক্রুসেডাররা লুসিগনানের নেতৃত্বে সুরের নিকটবর্তী শহর আক্কা অভিমুখে রওয়ানা করে। লুসিগনানকে ফ্রান্সে চলে যাওয়ার শর্তে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আট মাস বন্দি রাখার পর মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং সুরে গিয়ে পরাজিত ক্রুসেডারদের সঙ্গে মিলিত হয়। ওয়াদা ভঙ্গের কারনে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী খুবই ক্ষিপ্ত হন। তিনি আক্কায় পৌঁছার আগেই ক্রুসেডাররা আক্কায় পৌঁছে যায় এবং শহর অবরোধ করে। ক্রুসেডারদের কৌশলগত অবস্থান ও বিপুল শক্তিমত্তার দরুন সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ব্যর্থ হন। পূর্ণ দুই বছর অবরুদ্ধ থাকার পর মুসলমানরা ক্রুসেডারদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়।

এর মধ্যে বাইতুল মাকদিসে ক্রুসেডারদের সহযোগিতা করার জন্য ইউরোপে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টি হয়। আক্কা শহর ক্রুসেডারদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পর ইয়াফা, আসকালান, কায়সারিয়া, আরসোফ, হাইফা ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়। ৫৮৯ হিজরীতে মহাবীর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ইন্তেকাল করেন।

তার মৃত্যুর পর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মুসলিমরা এক চরম সংকটে পতিত হয়। এ সংকটের মোকাবিলায় তার ভাই আদিল এগিয়ে আসেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করেন। এরমধ্যে লেবাননের বৈরুত ক্রুসেডারদের দখলে চলে যায়। ৫৯৯ হিজরীতে চতুর্থ ক্রুসেড শুরু হয় এবং এটি লক্ষ্যভ্রস্ট হয়। আদিল ৫৯৮ হিজরী থেকে ৬১৫ অব্দি ১৭ বছর মুসলিমবিশ্ব শাসন করেন। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ে তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কোন অভিযান পরিচালনা করেন নি। নিজ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা রক্ষায় তিনি অধিক মনোযোগী ছিলেন। ক্রুসেডাররা এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং ৬১৫ হিজরীতে পঞ্চম ক্রুসেড সংঘটিত হয়। আদিল তখন মিশর থেকে ফিলিস্তিনে ছুটে আসেন এবং তার অনুপস্থিতিতে মিশর এর দখল ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়। ফলে মুসলিম ও ক্রুসেডারদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এ সময়ে মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি একটি প্রস্তাব পেশ করা হয় যা মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট অপমানজনক ছিল। প্রস্তাব করা হয়েছিল যে ক্রুসেডাররা দিময়াত ছেড়ে গেলে আল কুদস সহ সালাহউদ্দিন

আইয়ুবী কর্তৃক বিজিত সবগুলো অঞ্চল তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে তবে, কার্ক ও শোবাক অঞ্চল এ শর্তের বাইরে থাকবে। তাই পোপের প্রতিনিধি এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। ফলে মুসলিম — ক্রুসেডার সংঘর্ষের কোনো সমাধান হয়না।

এহেন অপমানজনক প্রস্তাবনা মুসলিমদের পক্ষ থেকে করার পরেও ক্রুসেডারদের পরাজিত করে আল্লাহ তায়ালা ফিলিস্তিনকে বিজয় দান করে এবং ক্রুসেডাররা কোনমতে জীবন নিয়ে পালায়।

হিজরী ৬২৪ সনে ৬ষ্ঠ ক্রুসেড সংঘটিত হয়। মাত্র ৫০০ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মনোবল শাসক ২য় কামিলের ছিল না। তিনি যুদ্ধ না করার শর্তে ক্রুসেডারদের হাতে আল কুদস সোপর্দ করে দেয়। তবে কুব্বাতুস সাখরা এবং আল আকসা মসজিদ এ শর্তের বাইরে ছিল। ৬২৫ হিজরীতে ক্রুসেডাররা আল কুদস বুঝে নেয়। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর আল কুদস জয়ের ৪৩ বছর পর এভাবেই আবার কুদস শহরের পতন ঘটে।

১২ বছর পরে ৬৩৭ হিজরী সনে নাসির দাউদ নিজ সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে আল কুদস কে ক্রুসেডারদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনে। দুঃখজনক ছিল এই যে, তার এ অভিযান ইসলামকে বিজিত করার উদ্দেশ্যে ছিল না। এ ঘটনার পরেই দামেশকের ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ইসমাঈল এসে নাসির দাউদের কাছ থেকে আল কুদসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং আবারও ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেয় এ পবিত্র শহরকে। এবার শুধু কুদসই নয়, কুব্বাতুস সাখরা এবং আল আকসা মসজিদ ও তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়। বিনিময়ে ইসমাঈল ক্রুসেডারদের থেকে মিশর দখলে সার্বিক সহায়তা লাভ করে। ৬৩৮ হিজরীতে আল কুদস দ্বিতীয়বারের মত ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

৬৪২ হিজরীতে সুলতান নাজমুদ্দীন আইয়ুব আল কুদস পুনরুদ্ধার করেন। এ খবর শুনে ক্যাথলিক পোপ সপ্তম ক্রুসেডের ডাক দেন। কিন্তু এ যুদ্ধে তাদের বিপুলসংখ্যক সৈন্য নিহত হয় এবং তারা পরাজিত হয়।

নাজমুদ্দিন আইয়ুবের মৃত্যুর পর মিশরের ক্ষমতা মামলুকদের হাতে যায় বিভিন্ন ঘটনার পরিক্রমার মধ্য দিয়ে। মামলুকদের শাসক সাইফুদ্দিন গাযায় মোতায়েন করা তাতার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করেন। সাইফুদ্দিন ছিলেন তাতার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের জন্য এক আশীর্বাদস্বরূপ।

এরপর একে একে যারাই ক্ষমতায় এসেছেন প্রত্যেকেই ছিলেন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সচেষ্ট। প্রত্যেকেই ক্রুসেড রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ক্রুসেডারদের উচ্ছেদ করেছেন মুসলিম বিশ্ব থেকে। এ সময়টাতে মুসলিমদের শাসনাধীনে থাকা ইহুদীরা বেশ শান্তিতে বসবাস করছিল। তবে খ্রিস্টান শাসনাধীন ইহুদীদের বাধ্য করা হচ্ছিল দেশ ত্যাগে। আর দেশে থাকার একমাত্র শর্ত ছিল খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করা। তাই ইহুদীরা নির্যাতন থেকে বাঁচতে, নিজেদের জীবন বাঁচাতে দলে দলে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহন করতে শুরু করে। এভাবে খ্রিস্টিয় জায়নবাদের সূচনা ঘটে।

উসমানী সাম্রাজ্যের উত্থানঃ

মামলুক সাম্রাজ্যের শেষের দিকে উসমান ইবনে আরতুগ্রালের মাধ্যমে উসমানীয় সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। হিজরী ৯২২ সনে উসমানী ও মামলুক সেনাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উসমানীরা জয়লাভ করে। এরপর একে একে ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন এবং মিশর জয় করে। এভাবে ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৪০০ বছর এ সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়। উসমানী শাসকরা মক্কা, মদীনায় অবস্থিত পবিত্র দুই মসজিদের মতোই আল আকসার পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ তৎপর ছিলেন। তাই এই শাসনামলে ফিলিস্তিনে স্থাপত্য এবং অবকাঠামোগত বিভিন্ন উন্নয়ন ঘটে। শেষ স্বাধীন উসমানীয় সুলতান খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ও ইহুদীদের নানা ষড়যন্ত্র আর প্রলোভনের মুখে আল আকসা রক্ষার্থে অনমনীয় ও দৃঢ়চেতা ছিলেন।

হিজরী ৬৪২ হিজরীতে আল কুদস কে ক্রুসেডারদের হাত থেকে পুনরুদ্ধারের পর থেকে এভাবেই প্রায় সাত শতাব্দী ধরে ইসলামী শাসন এর ধারা বজায় থাকে। ১৩৩৫ হিজরী/১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বাহিনীর আল কুদসে প্রবেশের মধ্য দিয়ে এর অবসান ঘটে।

ফিলিস্তিনের পতনের সূচনা

বিতাড়িত ইহুদীরা গিয়ে উসমানী খিলাফতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছিল কিছু ইহুদী প্রাণভয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন বাধ্য হয়ে, উসমানী সাম্রাজ্যেও তারা একই কাজ করে। ইহুদী থেকে ইসলামে প্রত্যাবর্তনের এ ছদ্মবেশ ধরে তারা গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে ঢুকে পড়ে। সেনাবাহিনীর উচ্চ পদগুলোতে গায়গা নেয় এবং 'ঐক্য ও প্রগতি সংঘ' গড়ে তোলে। খেলাফতের পতনে এ সংঘ বেশ বড় ভূমিকা পালন করে।

১৭৯৮-৯৯ সালে নেপোলিয়ন মিশরে গিয়ে ইহুদীদের রাষ্ট্র গঠনে আহবান জানায়। উসমানী খিলাফত মিশর উদ্ধারে সেনাপতি নিয়োগ দেয় কিন্তু সে ছিল ব্রিটিশদের হাতের পুতুল। এ সেনাপতির শাসনামলে ফিলিস্তিনবাসীর জন্য দুর্ভোগ নেমে আসে। তাদের উপর মোটা অংকের কর আরোপ করা হয় এবং ফিলিস্তিনবাসী এর প্রতিবাদ জানালে তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করা হয়। এ সময়ে তারা নানা জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়। এ সময়ে ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনে একজন কনসাল নিয়োগ দেয়া হয় যার প্রধান মিশন ছিল ইহুদীদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

১৮৭৪ – ১৯০৯ সাল পর্যন্ত ছিল খলীফা দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের শাসনামল। এ সময়ে রাশিয়ায় ইহুদী নির্যাতন হয়েছিল। ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড খলিফাকে বাধ্য করে এ ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিনে গ্রহণ করতে। তবে তিনি কঠোর ছিলেন যে এ ইহুদীরা কিছুতেই এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না।

সে সময়ে উসমানী খিলাফত বিভিন্ন ব্যয়ের বোঝায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে সুলতান আব্দুল হামিদকে ইহুদীরা প্রস্তাব দেয়, ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি তাদের কাছে দিয়ে দেয়া হলে, তারা সমস্ত ঋণ পরিশোধ করবে এবং আরো উপঢৌকন দিবে। খিলাফতের চরম দুর্দিনেও খলিফা এ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে। তিনি নিজের পায়ের নখ দিয়ে কিছু মাটি আঁচড়ে তুলে বলেছিলেন, "যদি তোমাদের সমুদয় সম্পত্তিও আমার পায়ে ঢেলে দেও, তবুও ফিলিস্তিনের এই পরিমাণ মাটিও তোমাদের হাতে তুলে দিবো না।"

১৮৮২ সনে খলিফার শাসনামলে ব্রিটেন মিশর দখল করে নেয় এবং ফিলিস্তিন থেকে আলাদা করে ফেলে। উসমানী সৈন্যদের একটা বিরাট অংশ ঐক্য ও প্রগতি সংঘের সাথে যোগদান করে, ইহুদীরাও এতে সমর্থন যোগায়। একদিকে আরব বিশ্বে জাতীয়তাবাদী চেতনা ছড়িয়ে পড়ে, অপরদিকে ক্ষমতবান ইহুদীরা একটি স্বতন্ত্র ইহুদী রাষ্ট্রের জন্য শক্তিশালী পরাশক্তিগুলোর কাছে লবিং চালাতে থাকে।

১৯০৯ সালে খলীফা আবদুল হামিদকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করা হয় যেখানে একাধিক ইহুদিও ছিল। ব্যক্তিত্বহীন এ নতুন খলিফা ছিলেন খিলাফত বিলুপ্তকরনেরই প্রথম ধাপ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ঐক্য ও প্রগতি সংঘ কর্তৃক উসমানি খিলাফতকে যুদ্ধের মুখোমুখি করা হয় এবং প্রতিপক্ষ হিসেবে পরিকল্পিতভাবেই জার্মানী কে দাঁড় করানো হয়। এ সময়

উসমানী সৈন্যবাহিনীর হালত যদিও খুব দূর্বল ছিল, তথাপি ফিলিস্তিনকে গুরুত্ব দিয়ে সেখানে নিরাপত্তার স্বার্থে এক লক্ষ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়।

১৯১৫ সালে মিশরে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ম্যাকমোহন ও শরীফের মাঝে এক চুক্তি হয়, চুক্তিতে বলা হয়েছিল শরীফ উসমানীদের ক্ষমতায় থাকা আকাবা বন্দর দখল করবে যেন ফিলিস্তিনে সহজেই ব্রিটিশরা প্রবেশ করতে পারে। চুক্তি মোতাবেক আরব বাহিনী আকাবা বন্দর দখল করে ব্রিটিশদের পথ সুগম করে দেয়।

১৯১৭ সাল ছিল মুসলিমদের জন্য বড় কঠিন এক সময়। রাশিয়ায় সংঘটিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লপবের ফলে গঠিত বিপ্লব পরিষদের বেশিরভাগ সদস্যই ছিল ইহুদি এবং তাদের মূল এজেন্ডা ছিল ফিলিস্তিনে একটি স্বাধীন ইহুদিবাদী রাষ্ট্র গঠন করা।

এ বছরই আসে ব্যালফোর ঘোষনা। ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনে নিযুক্ত উসমানী সেনাপতি কামাল আতাতুর্ক কে ক্ষমতার প্রলোভন দেখিয়ে ফিলিস্তিন থেকে সরে আসার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয়, তাই সে মুসলিমদের চাইতে ব্রিটিশদের স্বার্থরক্ষায়ই অধিক মনোযোগী ছিল। ব্যালফোর ঘোষনার মাত্র দুই সপ্তাহের মাথায় ব্রিটিশ বাহিনী ফিলিস্তিন দখল করে। তখন আরব বাহিনী ছিল ব্রিটিশদের সহায়ক। আর ফিলিস্তিনের সাধারন জনগণরাও ছিল আরব জাতীয়তাবাদের চেতনায় বিশ্বাসী। সেই বিশ্বাসকে ইহুদিদের স্বার্থে খুব ভালো করেই ব্যবহার করা হয়। তাদেরকে গলাধঃকরন করানো হয়েছিল যে ব্রিটিশরা এসে উসমানীয়দের হাত থেকে তাদেকে রক্ষা করবে। এভাবেই ফিলিস্তিনী মুসলিমদের মগজ ধোলাই করা হয়েছিল এবং তাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছিল।

ব্যালফোর ঘোষনা ও ইসরাইল রাষ্ট্রের সূচনার কথা

ব্যালফোর ঘোষনার নামকরন করা হয়েছে সাবেক ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার ব্যালফোরের নামানুসারে। ১৯১৭ সালে ব্যালফোর একটি ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জায়নিস্ট লিডার লর্ড শিল্ড কে যে চিঠি লিখেছিল তাই ইতিহাসে "ব্যালফোর ঘোষনা" নামে পরিচিত। চিঠিতে জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষনা দিয়ে বলা হয়েছিল, "ব্রিটেন সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত।" পরে এ ঘোষনাকে ব্যালফোর ঘোষনা বলে অভিহিত করা হয়।

এ ঘোষনায় ফিলিস্তিনি মুসলিম নাগরিকদেরও অধিকার সংরক্ষনের কথাও বলা হয়। তবে এটি ছিল নিতান্তই বিক্ষুব্ধ মুসলিমদের প্রতিবাদকে থামানোর একটি কৌশল।

জায়নিস্ট তৎপরতা ও তৎকালীন পরাশক্তিগুলোর সমর্থনে আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ করে। অথচ যুক্তি, ন্যায়-অন্যায়, মানবতা সবকিছুর বিচারে এ ঘোষনা ছিল একটি লজ্জাজনক অধ্যায়। কারন এটি একটি অবৈধ প্রতিশ্রুতি ছিল যেখানে অন্যায়ভাবে স্থায়ী ও বৈধ অধিবাসীদের উৎখাত করে দিয়ে অন্যদের সেই ভূখন্ডের উপর অধিকার প্রদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। এ প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছিল এমন এক পক্ষ থেকে যাদের নিজেদেরও কোনোরূপ অধিকার এ ভূখন্ডের উপর ছিল না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটাই সত্যি যে এই অবৈধ, অন্যায় প্রতিশ্রুতিই ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ ঘোষনা একদিকে যেমন ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়, অপরদিকে এর বাস্তবায়নও মিথ্যাচার আর অঙ্গীকারভঙ্গের এক দৃষ্টান্ত।

মূলত, এ ঘোষনার বহু আগে থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরর দৃষ্টি এ ভূমিতে ছিল আর তখন থেকেই ইহুদীদেরকে এ স্বার্থে ব্যবহারের চিন্তা কার্যকর হয়ে আসছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং ফ্রান্স,জার্মানী,রাশিয়া প্রভৃতি শক্তির সাথে টিকে থাকার লড়াই এ এগিয়ে থাকার জন্য এবং সর্বোপরি উসমানী খিলাফাতের পরে অন্য কোনো ইসলামী শক্তির উত্থান রোধের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন ছিল এক মিত্রশক্তির।

১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত ভূ রাজনীতি, ইতিহাস, খনিজসম্পদ ইত্যাদি বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা গোপন বৈঠকে বসে। সেই বৈঠক থেকেই একটি বিভাজন সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রের ধারনা উদ্ভূত হয় যার প্রধান কাজ হবে মুসলিম শক্তিকে অবনত রাখা এবং পশ্চিমাবিশ্বের স্বার্থরক্ষা। অপরদিকে জায়নবাদীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদী রাষ্ট্র গঠন করা যেখানে বিশ্বপরাশক্তিগুলোর সাহায্য অপরিহার্য ছিল। এখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও জায়নাব্দীদের স্বার্থ মিলিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে একটি নতুন বিশেষ ব্যবস্থার উদ্ভাবন ঘটে যার নামকরন করা হয় ম্যান্ডেট ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থানুযায়ী তুর্কী ও জার্মানীর শাসনাধীন অনুন্নত রাজনৈতিক অঞ্চলগুলোকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কিছুদিন উন্নত রাষ্ট্রগুলোর তত্বাবধানে

থাকা প্রয়োজন বলে যুক্তি দেখানো হয়। আদতে এ মিথ্যাচার দ্বারা শুধুমাত্র পরাশক্তিগুলোর সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন, শোষন বৃদ্ধিই ছিল একমাত্র মূল লক্ষ্য।
আরব নেতাদেরকে এই বলে আশ্বাস দেয়া হয় যে, ইহুদীদের আগমনে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়বে না।
তাদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা হবে। জনগনের ইচ্ছানুযায়ী শাসন পরিচালিত হবে। তাদের উন্নতি, অগ্রগতি ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত দেশগুলোর কাছে আমানতস্বরূপ থাকবে এবং এ অনুন্নত অঞ্চলগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত কেবলই পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করা হবে।
অথচ এ লিখিত ও মৌখিক প্রতিশ্রুতিগুলো ছিল মিথ্যা কূটচাল। প্রকৃত উদ্দেশ্য তো ছিল উসমানী খিলাফতের শাসনাধীন আরবশক্তিগুলোকে ভেঙ্গে দেয়া, বিভাজন সৃষ্টি করা এবং একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।
অতঃপর ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দক্ষিন ও মধ্য ফিলিস্তিনের অধিকার লাভ করে। ১৯১৮ সালে উত্তর ফিলিস্তিন দখল করে এবং ১৯২২ সালে ব্রিটেন ফিলিস্তিনের ম্যান্ডেট লাভ করে। পরবর্তীতে ব্যালফোর ঘোষনার বাস্তবায়নই ধীরে ধীরে ফিলিস্তিনে প্রকাশ পেতে থাকে। আরব জনগণের প্রতিবাদ, বিদ্রোহ কোনোকিছুই এর বাস্তবায়ন থামাতে পারেনি এবং তারা আন্তর্জাতিক এ কূটচাল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেনি। ১৯৩৯ সালে ব্রিটেন বাধ্য হয়ে এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করে যেখানে বলা হয়েছিল আগামী ১০ বছরের মধ্যে ফিলিস্তিনকে স্বাধীনতা দেয়া হবে এবং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ইহুদীদের অবাধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করা হবে। বলাইবাহুল্য এ অঙ্গীকার গুলোও মিথ্যাচার ব্যতীত কিছুই ছিল না। তাই এর বাস্তবায়ন আজও ঘটেনি।
বরং তার কয়েক বছর পর ফিলিস্তিনের ইতিহাসে যা বাস্তবায়িত হয় তার আলোচনা আমরা পরের অধ্যায়ে করবো ইনশা আল্লাহ।

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

ইহুদিকরন প্রকল্পে যে দুইটি বিষয়ে জোরদান করা হয় সেগুলো হলোঃ

১- ইসরাইল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় শক্তিবর্ধন ও নাগরিক সংখ্যা বৃদ্ধি। যেহেতু ইহুদিদের সংখ্যা ফিলিস্তিনে কম ছিল তাই এ জায়নবাদ প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে ইহুদিরা অবাধে ফিলিস্তিনে অবৈধভাবে প্রবেশ করতে শুরু করে ও প্রচুর পরিমানে জমি কিনতে শুরু করে।

২- সব ধরনের সমরাস্ত্র ও আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা ইসরাইলকে উন্নত করা। এ কারনেই ইসরাইল বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহুদি নির্যাতনের নাম দিয়ে এবারেও ফিলিস্তিনে অবাধে ইহুদি প্রবেশ করতে থাকে। এবং ইহুদী হত্যার মিথ্যা গল্প বানিয়ে বিশ্ববাসীর সহমর্মিতা আদায় করতে শুরু করে, তাদের প্রচারণা ছিল যে হিটলার ৬০ লক্ষ ইহুদি হত্যা করেছে অথচ সারা বিশ্বে তখন এই সংখ্যক ইহুদি ছিল কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। ২য় বিশ্বযুদ্ধে নতুন পরাশক্তি হিসেবে আমেরিকার উত্থান ঘটে। ইহুদীরা তখন নিজস্বার্থ হাসিল করতে ব্রিটেনের বদলে আমেরিকার পক্ষ অবলম্বন করতে শুরু করে।

১৯৪৬ সালে ইংগো মার্কিন জোট যে তিনটি দাবি উত্থাপন করে সেগুলো ছিল,

১। ফিলিস্তিনে এক লক্ষ ইহুদীকে জায়গা দিতে হবে।

২। ফিলিস্তিনে সবার জন্য জমি কেনার সুযোগ প্রদান করতে হবে।

৩। ফিলিস্তিনে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন করতে হবে।

আরবদের প্রতিবাদের মুখে বিষয়টি জাতিসংঘের দায়িত্বে দেয়া হয়। জনসংখ্যার দিক থেকে ইহুদীরা ৩২% হওয়া সত্বেও তাদের জন্য ৫৬.৫% ভূমি বরাদ্দ করে দেয়া হয়। অপরদিকে ফিলিস্তিনিদের জন্য দেয়া হয় ৪৩% ভূমি। বাকি ০.৫% থাকে আলকুদস অঞ্চল কারন সেটি আন্তর্জাতিক অঞ্চল। ১৯৪৭ সালে এ প্রস্তাব কার্যকর হয়।

বলপ্রয়োগ, হুমকি আর বেআইনি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ১৯৪৮ সালে গঠিত হয় অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল।

যেহেতু আরবলীগ সৃষ্টিই হয়েছিল ব্রিটেনের হাতে তাই আরবলীগ সম্পূর্ণ সহযোগিতা দেয় তাদেরকে। সশস্ত্র সংগ্রামে ফিলিস্তিনি জনগন অস্ত্র সহায়তা চাওয়ার পরও এ সহায়তা প্রদানে আরবলীগ বিরত থাকে। ব্রিটিশ বাহিনী ফিলিস্তিন ত্যাগের আগে পর্যন্ত সেখানে প্রবেশে অসম্মতি জানায় আরব বাহিনী। এভাবেই, পরোক্ষ সহায়তা পেয়ে ইহুদীদের হাতে একে একে পতন হতে থেকে ফিলিস্তিনের শহরগুলোর। আরব বাহিনী মুজাহিদদের বের করে দেয় দেশ থেকে। তারা শুধুমাত্র সেসব অঞ্চলেই অভিযান চালাতো যেসব অঞ্চল ইসরাইলের অংশে ছিল। এভাবে ইহুদীদের দখলদারিত্বের পথ সুগম করে তোলা হয়েছিল। প্রায় ৮ লক্ষ ফিলিস্তিনীকে বিতাড়িত করা হয় স্বদেশ থেকে। এরপর ইহুদীরা বিভিন্ন আরব দেশগুলোর সাথে চুক্তির মাধ্যমে ফিলিস্তিনের বাকী অংশটুকু ভাগাভাগি করে নেয়।

আরব দেশগুলো ও ইহুদীদের এ চুক্তির পর জাতিসংঘ ইসরাইলকে সদস্যপদ প্রদান করে। এরপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ অবৈধ রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ইসরাইলকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দেশ যুক্তরাষ্ট্র। অরে ধাপে ধাপে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেনসহ অন্যান্য দেশগুলো একে স্বীকৃতি দান করে।

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে পরিস্থিতি ভয়ানক আকার লাভ করতে শুরু করে। সব নিয়মনীতি এড়িয়ে ফিলিস্তিনের প্রতি ইহুদীরা আগ্রাসী হতে শুরু করে। সন্ত্রাস আর হত্যাযজ্ঞের ইতিহাস ব্যতীত এরপরের সময়টুকুতে অন্য কিছুই নেই। লাখ লাখ ফিলিস্তিনী নিজ আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে শরণার্থী হিসেবে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নেয়।

এ গণহত্যা, নির্যাতন, জুলুম সেই থেকে এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান। ফিলিস্তিন এর চারপাশে আরব দেশগুলো দ্বারা বেষ্টিত হয়েও ফিলিস্তিনী মুসলিমদের এ মুক্তিসংগ্রাম শুধুই এই নিরীহ মানুষগুলোর। কোন আরব রাষ্ট এই অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত নয় অথবা ইচ্ছুক নয়। অপরদিকে নিরীহ মুসলিমদের সমূলে ধ্বংস করতে পশ্চিমা দেশগুলোর ছিল প্রকাশ্য অবস্থান , যা এখনো এখনো বর্তমান।

ফিলিস্তিনিদের বর্তমান অবস্থা, আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম

ফিলিস্তিন ঘিরে ইহুদীদের আগ্রাসন আজকে সাত দশকের ও বেশি সময় ধরে। প্রতি মুহূর্তে তারা রয়েছে মৃত্যু আশঙ্কায়। পবিত্র ভূমি এখন এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে, গাজা উপত্যকা ভেসে যাচ্ছে রক্তের বন্যায়। সন্তানহারা মায়ের কান্না, বাবাহারা সন্তানের চিৎকারে ভারী হয়ে আছে ফিলিস্তিনের বাতাস বছরের পর বছর ধরে। খাবার নেই, পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই, জীবন যাপনের মৌলিক ব্যবস্থা, চিকিৎসা সরঞ্জাম কোন কিছুরই ব্যবস্থা নেই। তার সাথে প্রতিদিন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নিহত - আহতের সংখ্যা।

যারা কোনমতে দিনানিপাত করছে তাদের ও বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদান গুলোর আঞ্জাম নেই। বহির্বিশ্বের সাহায্য আসার পথ বন্ধ, নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে জীবন বাঁচানোর পথ বন্ধ। খুঁজে খুঁজে জনসমাগমপূর্ণ জায়গা গুলোতে হামলা করা হচ্ছে। নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে বলে, সেই আশ্রয়কেন্দ্রেই হামলা করা হচ্ছে। অফিস আদালত, ঘরবাড়ি, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা থেকে শুরু করে মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল যেখানেই মানুষ আশ্রয় নিচ্ছে সেখানেই হানাদাররা হামলা চালাচ্ছে। হাসপাতালগুলোতে সমস্ত নিয়মনীতি উপেক্ষা করে বোমা হামলা চালানো হচ্ছে যা যুদ্ধনীতির পরিপন্থী। সবচেয়ে নির্মম ব্যাপার হলো, ইসরায়েলী সৈন্যবাহিনীর টার্গেট ছোট্ট শিশুরা যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এখনই সমূলে ধ্বংস করে দেয়া যায়।

ফিলিস্তিনি জনগনের জীবন মানেই এখন ভয়, আশংকা, দুঃখ, দুর্দশা, কান্না, প্রিয় মানুষ হারানোর চাপা ব্যথা আর অনিশ্চিত জীবন। সেখানে ঘরবাড়ি বলতে এখন শুধুই ধ্বসে যাওয়া কিছু ভবনের আবশিষ্টাংশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো তালাবদ্ধ, অর্থনৈতিক বয়কট, হুমকি আর মৃত্যুর অঘোষিত পরোয়ানা। যেকোন সময় বিমানযোগে বোমা হামলা, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সাথে জানাজার সালাত পড়া তাদের এখন তাদের জীবনের একটি স্বাভাবিক অংশে পরিণত হয়েছে। কত মসজিদ গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, কত নারী বিধবা হয়েছে, কত শিশু এতিম হয়েছে, কত অসংখ্য গণকবর যে রয়েছে ফিলিস্তিনের মাটিতে !

সম্প্রতি চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রথম দশদিনের শহীদের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের ও অধিক, যার এক তৃতীয়াংশ ছিল শিশু। আহত হয়েছিল বারো হাজারের ও অধিক।

কিন্তু এমতাবস্থায় ও ফিলিস্তিনীদের সাহস, ঈমানী দৃঢ়তার কথা আমাদের চিন্তারও অতীত। আল্লাহর এই বান্দাগন প্রতিদিন, রাতে জুলুম নির্যাতন সহ্য করে আসছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। তাদের লাশ পড়েছে, পরদিন তারা তারচাইতেও বড় সংখ্যায় ফিরে এসেছে। মসজিদে নামাজরত ,ইতিকাফরত মুসল্লিদের উপর গুলি চালানো হয়েছে তো পরদিন তার চেয়েও বড় সংখ্যক জামাত দেখা গিয়েছে মসজিদগুলোতে। অনেক নারী বিধবা হয়েছে, সন্তান হারিয়েছে কিন্তু জিহাদের ময়দান থেকে স্বামী সন্তানকে ফিরে আসতে বলেননি। দখলদার ইসরাইল যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিনের ঈমানদারগোষ্ঠী তাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয়নি। এটাই মূলত অর্জন। এখানেই ফিলিস্তিনীদের জয় এবং দখলদারদের পরাজয়। ফিলিস্তিনজুড়ে যে

তান্ডবলীলা চলছে তাতে নিহতদের স্বজন ও আহতরা কেবলই আল্লাহর উপর ভরসা করে। তারা বারবার উচ্চারণ করে, হাসবুনাল্লহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল। আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে শিশুরা কুরআন হিফজ করছে, কুরআনকে আত্মস্থ করছে। অসুস্থরা কুরআনকে শিফা হিসেবে গ্রহন করছে। এর চাইতে দৃঢ় ঈমানের পরিচয় আর কিসে মিলতে পারে !

গত সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে জুলুমের শিকার হতে হতে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের মনোবল আরো বেড়েছে, ঈমান আরো মজবুত হয়েছে। একইসাথে রণকৌশল ও রণাঙ্গনের প্রস্তুতিও গ্রহণ করছে। তাই পূর্ণাঙ্গ ঝড়ের প্রস্তুতি নিয়েই তারা আজ মাঠে নেমেছে, এর নাম "তুফানুল আকসা।"

তুফানুল আকসা

আল আকসা পুনরুদ্ধারে দীর্ঘ সাত দশকেরও বেশি সময় যাবত যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তার মধ্যে ফিলিস্তিনের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় আর সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল "তুফানুল আকসা।"

৭ অক্টোবরের এ হামলার সুযোগ খোদ ইসরাইলই তৈরী করে দিয়েছে। গাজা সীমানায় দেয়াল, সার্ভিলেন্স ক্যামেরা, অত্যাধুনিক সেন্সর ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে ইসরাইল তার সৈন্যবাহিনীর একটি বিরাট অংশকে পশ্চিম তীরে সরিয়ে নেয়।

হামাস এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়ে ইসরাইলে হামলা করে। প্রথমে প্রচুর পরিমাণে রকেট নিক্ষেপ করা হয় ইসরাইলের সীমানা লক্ষ্য করে। তারপর ড্রোনের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী নজরদারি টাওয়ার, সেন্সর ও ক্যামেরাগুলো নষ্ট করে দেয়। যার ফলে সেগুলো হেডকোয়ার্টারে কোনো তথ্য পাঠাতে পারেনি। এ সুযোগে প্যারাগ্লাইডিং এর মাধ্যমে তারা দেয়ালের ভেতরে ঢুকে সামরিক স্থাপনায় হামলা করে। একপর্যায়ে হামাস সদস্যরা দেয়াল ভেঙে ফেলে। একইসাথে তারা সমুদ্রপথেও হামলা করে। পরিকল্পিতভাবে একে একে সামরিক স্থাপনায় হামলা এবং ইসরাইলী নাগরিদের অপহরণ করতে শুরু করে। ইহুদীদের মনে আতঙ্ক ধরিয়ে দেয়ার জন্য হামলার ভিডিও খুবই গুরুত্বসহ মিডিয়ায় প্রচার করা হয়। আর এ হামলার ভিডিওগুলো সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দেয়।

এটি ২০২৩ সালের সবচেয়ে আলোচিত ও বিশ্বের কুফরি শক্তি আর তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় রোমহর্ষক ঘটনা। তাই এর নামকরণ 'তুফানুল আকসা'ই যথার্থ হয়েছে। কারন এই তুফান পরিচালিত হয়েছে এমন একটি দেশের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যাদেরকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি বলে প্রচার করা হচ্ছে বিগত কয়েক যুগ থেকে। যাদেরকে অপ্রতিরোধ্য বলে ধারনা করা হচ্ছে। যে ইসরাইলের ভয় দেখিয়ে আরব রাষ্ট্রগুলোকে কাবু করে রেখেছে ইউরোপ-আমেরিকা, যে ইসরাইলকে সারা পৃথিবীর সমস্ত কুফুরি শক্তি, সামরিক এবং বেসামরিক সংস্থা সহযোগিতা দিয়ে এসেছে, যে ইসরাইলের গোয়েন্দাসংস্থাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাবিভাগ বলে প্রচার করা হয়েছে, যে ইসরাইলের কাছ থেকে বহু দেশের নেতারা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নজরদারি যন্ত্র কিনছে- এ তুফান পরিচালিত হয়েছে সে ইসরাইলের বিরুদ্ধে।

পৃথিবীর সেরা শক্তিশালী সামরিক শক্তি, কূটনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে কারা পরিচালনা করছে এ তুফান?

যে মানুষগুলো যুগ যুগ ধরে একটা উন্মুক্ত কারাগারে বন্দী হয়ে আছে। যেখানে মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় খাবার ,পানি, মৌলিক সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত ,যাদের মাথার উপর রাতদিন উড়ে বেড়ায় শত্রুবাহিনীর উড়োজাহাজ, যাদের সবকিছুই তাদের নখদর্পনে। আজকে

যে যুবকেরা এ অভিযান পরিচালনা করছে তাদের জন্ম, বেড়ে উঠা ফিলিস্তিনের ইতিহাসের এই বিভীষিকাময় অধ্যায়ের মধ্য দিয়েই।

এ অভিযানের প্রতিক্রিয়াঃ

তূফানুল আকসার যে প্রতিক্রিয়া চলছে তা হামাস ও বিশ্বের কাছে অনুমেয় ছিল। হিংস্র পশু বা বিষাক্ত সাপকে কেউ আঘাত করলে যেরকম প্রতিক্রিয়া দেখায়, বর্বর ইসরাইলী গোষ্ঠী ঠিক তাই দেখিয়ে চলছে। নিরপরাধ ও নিরস্ত্র গাজা ও ফিলিস্তিনবাসীর ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালাচ্ছে। হত্যা করছে হাজার হাজার নারী-শিশু ও বেসামরিক মানুষ। গুড়িয়ে দিচ্ছে সাধারণ মানুষের বাড়িঘর। বোমা বর্ষণ করে যাচ্ছে অনবরত। হামলা চালাচ্ছে চারদিক থেকে। হাসপাতালে থাকা অসুস্থ, নিরস্ত্র বৃদ্ধ থেকে শিশু কেউ বাদ যাচ্ছে না এই ঘৃণ্য হামলা থেকে। এ জঘন্য কাজে বরাবরের মতো তাদেকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে তাদের পশ্চিমা প্রভুরা। ওই আঘাতের পর থেকে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ব্রিটেন, ফ্রান্সের ক্ষমতাবানরাসহ তাদের লালন-পালনকারী সেই চিহ্নিত ইসলামের দুশমন গোষ্ঠী তৎপর হয়ে উঠেছে।

এ অভিযানের পর ইসরাইল যখন নিরীহ মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালাতে শুরু করলো, তখন থেকেই অনেকে ভাবছে, হামাস এই সময় এই 'তুফান' শুরু না করলে তো ইসরাইলও এই তাণ্ডব চালাতো না- তাদের উদ্দেশে যে কথাটি তা হলো, পূর্বের ইতিহাস জানলে, ফিলিস্তিনের ভূমিতে মুসলিমদের এ অত্যাচার নির্যাতনের উপাখ্যান জানলে, ইসরাইলের পরবর্তী পদক্ষেপ, তাদের এজেন্ডা, এবং কুফরি বিশ্ব তো বটেই বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের সাথে ইসরাইলের সম্পর্কের অগ্রগতি, কী হচ্ছিল, কী চলছিল, কী হতে যাচ্ছিল- অন্তরালের সেই খবরটা জানলে হামাসের এ অভিযানের যৌক্তিকতা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যেতো।

২০১৮-এর মে মাসে জেরুজালেমকে, যেখানে রয়েছে মুসলমানদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস, ফিলিস্তিনের সেই হৃৎপিণ্ডকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে আমেরিকা। এত বড় পদক্ষেপে শুধুমাত্র মোড়লিপনা আর পেশির জোর নয় বরং নিশিচভাবেই আলআকসা ভূমির চারদিক ঘিরে রাখা আরবদেরও তাতে সায় ছিল, এমনকি সহযোগিতাও ছিল। ঠিক যেমন এখন একইভাবে এ গণহত্যার প্রতিবাদের ভাষা এ মুসলিম দেশগুলোর কাছে নিষ্ক্রিয়তা আর নিশ্চুপ থাকা। এটাই কি এ গণহত্যার পক্ষে নীরব সমর্থন নয়?

বর্তমানে কতক মুসলিম দেশ ইসরাইলের সাথে স্বাভাবিক মেলামেশা শুরু করেছে। কোনোরকম চক্ষুলজ্জা ছাড়া, বিগত সত্তর বছরের শহীদানের রক্তের ঋণ ভুলে গিয়ে এ বেইমানী তারা তাদের নিরীহ মুসলিম ভাইদের সাথে করতে পেরেছে। অবস্থা যে পর্যায়ে গিয়েছিল, হামাসের এই তুফান না হলে আল্লাহ জানেন, হয়তোবা বিশ্বমঞ্চ থেকে ফিলিস্তিন উপাখ্যানটি চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেত, মাটিচাপা পড়ে যেত! মুসলমানদের এই গৌরবময় পিতৃভূমি একদিন জোর করে ইহুদীরা কেড়ে নিয়েছিল, যে ভূমির অধিকার ফিরে পেতে সাতটি দশক ধরে লড়ছে মজলুম ফিলিস্তিনীরা- এ গল্প মানুষ ধীরে ধীরে ভুলে যেত...।

সবশেষে সৌদি আরবও যখন খোলাখুলি ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাচ্ছিল বলে গুঞ্জন তৈরি হয়েছে- ঠিক সেই মুহূর্তেই হামাসের 'প্যারাগ্লাইডার' উড়ে এসে পুরো দৃশ্যপট পাল্টে দিয়েছে।

'তূফানুল আকসা' দুনিয়াবাসীকে চোখে আঙুল দিয়ে অনেকগুলো বিষয় দেখিয়ে দিয়েছে। বলতে হয়, নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে, এ দেশসহ পৃথিবীর ওইসকল দেশের ক্ষমতাবানদের, যারা নিজেদের নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণের জন্য, ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য, নিজেদের নিরাপত্তা ও স্থায়ী দখলদারিত্ব বহাল রাখার জন্য তলে তলে ইসরাইলের গোয়েন্দাদের সহযোগিতা নিয়ে থাকে। যারা ইসরাইল থেকে গোয়েন্দা যন্ত্রপাতি কেনে, নাগরিকদের ফোনে ও ব্যক্তিগত জীবনে আড়ি পাতে, তাদেকে বুঝিয়ে দিয়েছে এ গোয়েন্দাগিরি, গোয়েন্দা-সরঞ্জাম কোনোটাই চূড়ান্ত শক্তি নয়। কোনোটিই অপ্রতিরোধ্য নয়। একটি-দুটি টর্নেডোই সবকিছু ভাসিয়ে নিতে পারে। ভেস্তে যেতে পারে সকল পরিকল্পনা।

তুফানুল আকসা এভাবেই আরো অনেক কিছুরই ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীকে।

কুফরি বিশ্ব এবং জাতিসংঘের ভূমিকা

বিশ্বের সমস্ত কুফরি শক্তিই তা সে যে ধর্মই হয়ে থাকুক না কেন, ইসলাম বিদ্বেষের ক্ষেত্রে তারা এক ও অভিন্ন।

কুফরি বিশ্বের ভূমিকাঃ

ফিলিস্তিনকে অবৈধভাবে দখল হওয়ার যে সুযোগ তৈরী করে দেয়া হয়েছে তা কুফরি বিশ্বের হাত ধরেই, আর বর্তমানে এ দখলের এবং জুলুম, হত্যাকাণ্ডের পাশে রয়েছে যেসব দেশ তারাও কুফরি শক্তি এবং বরাবরের মতই ইসরাইলের সমর্থক। তারা ইসরাইলকে সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে মুসলিম নিধনে। ফিলিস্তিনী জাতিকে সমূলে নিধন করতে তারাও ইসরাইলের মতোই তৎপর। তা না হলে এ সহিংসতা বন্ধে তাদের কোন ভূমিকা কেন নেই?

আবার কিছু দেশ আছে যারা ইসরাইলকে সমর্থন দিচ্ছেনা সরাসরি, আবার ইসরাইলের বিরুদ্ধেও তাদের কোন বক্তব্য নেই। যেমন চীন বা অন্যান্য দেশ। তারা নীরব দর্শক। এও তো সমর্থনেরই নামান্তর। এ দেশগুলো পরাশক্তি হয়েও আর্থিক বা সামরিক কোন সহায়তা এ মজলুম দেশটিকে দিচ্ছেনা। কুরআনের সেই আয়াতেরই যেন বাস্তব নমুনা দেখতে পাই আমরা,

وَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بَعۡضُهُمۡ اَوۡلِیَآءُ بَعۡضٍ.

যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা পরস্পরে একে অন্যের ওলি-ওয়ারিশ। -সূরা আনফাল (৮) : ৭৩

বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র। ইসরাইলি সৈন্যবাহিনীর এই ধ্বংসযজ্ঞে সরাসরি মদদ ও সমর্থন রয়েছে আমেরিকার। তুফানুল আকসার পরে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অতিদ্রুত তেল আবিব সফর, ইসরাইলের নিরাপত্তায় রণতরী মোতায়েন, সব ধরনের নিরাপত্তা প্রদানের আশ্বাস এ সবকিছুই যেন অতি স্বাভাবিক। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার অমুসলিম মানবতার খাতিরে এ গণহত্যার, বর্বরতার বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছে সেখানে তার এমন পক্ষপাতমূলক আচরণ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিচারিতাকেই প্রকাশ করে। এর পূর্বেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ফিলিস্তিনীদের বিভিন্নভাবে কোণঠাসা করা এবং আরব দেশগুলোর সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠকরণে ও সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রেখে গেছে। এছাড়াও, জাতিসংঘের সাধারণ সভায় উত্থাপিত যেকোন ইসরাইলবিরোধী প্রস্তাবে অথবা এ সহিংসতা বন্ধে কোন আইন পাশ হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে সেখানে সবার আগে ভেটো দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

পশ্চিমা প্রভাবশালী দেশগুলোর ইসরাইলপ্রীতি নতুন কোন ঘটনা নয়। কারন ফিলিস্তিনের আজকের এই পরিণতির হাতেখড়ি এ কুফরি বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোরই মাধ্যমে। তাদের মদদপুষ্ট ইসরাইলকে ব্যবহার করিয়ে, তাদের স্বার্থেই ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করিয়েছে। যদি ইহুদীদের প্রতি শুধুমাত্র সহানুভূতি থেকে পৃথক ইহুদী রাষ্ট্র গঠন করে দিতো তবে সেটা কেন মধ্যপ্রাচ্যে? কেন অন্যের ভূমি দখল করে অবৈধভাবে?

আমেরিকা ছাড়াও বিশ্বের যে প্রভাবশালী, শক্তিশালী দেশগুলো আছে তারা প্রত্যেকেই ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে নিশ্চুপ। প্রতিটি দেশই একটি দীর্ঘ সময় ধরে চলমান গণহত্যার স্বাক্ষী হয়ে রয়েছে কিন্তু কোন অবস্থান গ্রহণ করেনি। কোন রাষ্ট্র যদিওবা, মৌখিকভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে কিন্তু কঠোরভাবে ইসরাইলের বিরোধীতায় কোন কুফরি রাষ্ট্র আজ অবধি এগিয়ে আসেনি।

জাতিসংঘের ভূমিকাঃ

জাতিসংঘের সাংগঠনিক কাঠামো দেখলে বোঝা যায় জাতিসংঘ কোন মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য নয়, দূর্বল রাষ্ট্রের জন্য নয়। জাতিসংঘ তাদের হাতেই গঠিত যারা মুসলিম ও দূর্বল রাষ্টগুলোকে টার্গেট করে নিজেদের আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করে বসেছে পৃথিবীতে। জাতিসংঘ একটি বিশ্ব সংস্থা হওয়া সত্বেও কোন মুসলিম রাষ্ট্রের স্বার্থে জাতিসংঘকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি।

ফিলিস্তিন সংকটেও তাই বরাবরের মতো জাতিসংঘ নিশ্চুপ। বিশ্বের অন্যান্য বিষয়ে বেশ জোরালো ভূমিকা থাকলেও এক্ষেত্রে জাতিসংঘের আচরণ হতাশাজনক ও এই সংস্থা এখানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। জাতিসংঘের মহাসচিব গাজা পরিদর্শনে গিয়েছেন, ত্রাণ কার্যক্রম দেখেছেন। তিনি বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছেন যুদ্ধ বন্ধ হবার, যুদ্ধবিরতি প্রদান করার, হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার। কিন্তু আদতে এগুলোর কার্যকারিতা কতটুকু যেখানে যেকোন ইসরাইলবিরোধী প্রস্তাবনা উত্থাপিত হওয়ার পরই সেখানে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো প্রদানের মাধ্যমে আইন বানচাল করে দিচ্ছে। জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যপদ প্রাপ্ত পাঁচটি দেশের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে , যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্যে অন্যতম। তাই ভেটো পাওয়ার রেখে কখনোই জাতিসংঘ মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা হবে এমন কোন আইন পাশ করাতে পারবেনা। এ নিয়ম পরিবর্তন হয়ে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে প্রস্তাব পাশ করা যায়, আইন পাশ করা যায় তবে ফিলিস্তিন সংকটে জাতিসংঘের কোন ভূমিকা বাস্তবতায় রূপ পাবে, অন্যথায় নয়।

এইযে জাতিসংঘে যত প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়া হয়, অন্যের দেশ দখলের শিকার হয়, সেই দেশের ভূমি নিজেদের ইচ্ছামতো বন্টন করা হয়, এসবের হর্তাকর্তা তো তারাই। তারাই প্রস্তাব করে, প্রস্তাব পাশ করে অতঃপর দখল করে। লীগ অফ নেশনস (এটি বর্তমানে জাতিসংঘ) এসব কুফরি দেশগুলোর স্বার্থে গঠিত।

যেখানে এক লক্ষ ইহুদীও ততদিনে ফিলিস্তিনে ওঠেনি, সেখানে ১৯৪৯ সালে জাতিসংঘ ইসরাইলকে স্বীকৃতিও দেয়, সদস্যও করে নেয়। এখন জাতিসংঘ যা কিছুই বলুক, যত সহানুভূতি প্রকাশ করুক, যত শান্তি স্থাপনেরই আহবান জানাক না কেন এই অবৈধ দখলদার রাষ্ট্রটিকে এখানে বসতে দেওয়া, স্বীকৃতি দেওয়ার পুরো দায়ই জাতিসংঘের ওপর বর্তায়। জাতিসংঘ অন্যের জমিতে ইসরাইলকে স্বীকৃতি না দিলে, সদস্য না বানালে আন্তর্জাতিকভাবে এ দেশটি এখনোও একটি অবৈধ দেশ হিসেবেই থাকত।

তাই দুনিয়ার মুসলমানদের বুঝতে হবে, অন্যের কাছে, কোনো কুফুরি শক্তির কাছে তেমন কিছু আশা করে লাভ নেই। দিন শেষে তারা সকলেই একে অপরের ভাই হিসেবেই দেখা দেবে। এবং জাতিসংঘের কার্যক্রম অনেকটা এমন যে, আঘাত করে সেই আঘাতের উপরেই আবার ফুলের সমবেদনা জানানোর মতো। তাই, বাস্তবতা এটাই যে বর্তমানে জাতিসংঘ যে কাঠামোর উপর পরিচালিত হচ্ছে এই কাঠামোতে সংস্থাটি যতদিন আছে ততদিন একে নিয়ে আশাবাদী হওয়ার মতো কিছুই নেই।

মুসলিম বিশ্ব এবং ওআইসি এর ভূমিকা

যেহেতু ফিলিস্তিন একটি মুসলিম দেশ এবং এত দীর্ঘকাল ধরে দেশটিতে সহিংসতা-সংঘাত চলছে, তাই যখন প্রশ্ন আসে এই মজলুমদের পাশে কে দাঁড়াবে? কে তাদের পক্ষে কথা বলবে? তখন স্বাভাবিক ভাবেই সবার নজর যায় মুসলিম বিশ্বের দিকে।

মুসলিম বিশ্বের ভূমিকাঃ

বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশগুলো শুধু সীমানার দিক থেকে নয় বরং আদর্শের দিক থেকেও খন্ডিত, বিখন্ডিত। আজকের মুসলিম বিশ্বে একটি গোষ্ঠী ক্ষমতাধর। অর্থ-সম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তির বলে তারা ক্ষমতার কলকব্জা নাড়ে। আরেকটি গোষ্ঠী সাধারন মুসলিম।

সাধারন মুসলিম গোষ্ঠীর সকলেই আজকে মজলুমদের পক্ষে। কোথাও বিক্ষোভ করে, কোথাও বক্তব্যের মাধ্যমে, বিবৃতির মাধ্যমে মনের কষ্ট ও ফিলিস্তিনীদের প্রতি আন্তরিকতার কথা জানান দিচ্ছে। যারা নিয়মিত ইসলাম চর্চা করে, যারা করেনা, যে শুধু আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু আমল করেনা এমন মুসলিমরাও আজ নিজ নিজ অবস্থান থেকে ফিলিস্তিনের সাথে সংহতি প্রকাশ করছে।

কিন্তু, অপর গোষ্ঠী যারা ক্ষমতার আসনে রয়েছে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে নেতৃত্ব দিচ্ছে মজলুমদের স্বার্থে এই দেশগুলোর এবং এদের রাষ্ট্রপ্রধানদের অবদান শূণ্যের কোঠায়। মুসলিমদের স্বার্থে, ইসলামের স্বার্থে তাদের দৃশ্যমান কোন পদক্ষেপ নেই। অথচ তারা এই সাধারন মুসলিমদের অর্থের জোরে বিলাসিতা-প্রাচুর্যের জীবনযাপন করছে। লোকদেখানো কিছু গোলটেবিল বৈঠক আর মনভোলানো কিছু পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যতীত এই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কোন পদক্ষেপ নেয়নি ফিলিস্তিনের এই বিপর্যয়ে।

মুসলিম বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোর মধ্যে ইরান ছাড়া কোন দেশকে উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে না। বরং কিছু কিছু মুসলিম দেশের প্রতিক্রিয়া ছিল একবারেই নখদন্তহীন। বিশ্লেষকরা বলছেন, ফিলিস্তিন সংকটে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান একাট্টা হলেও অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক কাঠামোর দূর্বলতার কারনে সরকারগুলোর পক্ষে শক্ত অবস্থান নেয়া সম্ভব হচ্ছেনা। মূলত ইসরাইলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ও শক্ত অবস্থানে যাওয়ার পথে বড় সীমাবদ্ধতা হলো পশ্চিমাদের অবস্থান এবং ক্ষমতার লোভ ও মোহ। এ ক্ষমতার লোভের কারনে তাদের অন্তরে ভীতি ঢুকে বসেছে। এ ভয়ের কারণে আজকে আরব রাষ্ট্রগুলো, মুসলিম রাষ্ট্রগুলো মজলুম ফিলিস্তিনীদের বাদ দিয়ে ইসরাইলের সাথে বন্ধুত্বে মেতে উঠেছে। ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্বে মেতে উঠেছে। মুসলিমদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

তুফানুল আকসার মাসখানেক আগেই সৌদি আরব ইসরাইলের সাথে নিজেদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য কাজ করার পরিকল্পনা নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেছিল। এর আগেই ২০২০ সালে আমেরিকার তত্ত্বাবধানে ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরী করেছিল আরব বিশ্বের আরেক প্রভাবশালী দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। সেখানে

ইসরাইল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যেকার চুক্তিতে বলা হয়েছিল এ চুক্তির মাধ্যমে ফিলিস্তিনের স্বার্থ রক্ষা পাবে। পশ্চিম তীরে ও গাজায় নতুন করে ইসরাইলি বসতি স্থাপন বন্ধ হবে। এই চুক্তির ৪ বছর পার হয়ে গেলেও এর বাস্তবায়ন ঘটেনি। বরং দেশটি হামাসের হামলার সমালোচনা করে দেয়া বিবৃতিতে ইসরাইলি নাগরিক জিম্মির নিন্দা করলেও, ইসরাইলের গণহত্যার ব্যাপারটি উল্লেখ করেনি। বাহরাইনও হামাসের হামলার নিন্দা জানিয়েছে।

অপরদিকে মিশর তো ১৯৮০ সাল অর্থাৎ বহু আগে থেকেই ইসরাইলের সাথে চুক্তিবদ্ধ! সম্প্রতি রাফাহ সীমান্তে ইসরাইলের বর্বরোচিত বোমা হামলা এবং অগ্নিসংযোগে হাজার নিরীহ মুসলিম অসহায় অবস্থায় শহীদ হয়, কিন্তু মুসলিম ভাইদের আর্তচিৎকারেও মিশরের বদ্ধ সীমান্তের দ্বার খোলে নি।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠের অবস্থা হচ্ছে, বড় বড় বক্তব্য থাকলেও বাস্তবে কিছুই হচ্ছে না। বিশেষ করে আরব শাসকরা ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক জোরদার করতে, বাণিজ্যিক চুক্তি করতে ব্যস্ত।

ওআইসির ভূমিকাঃ

বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষা ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা হল ওআইসি। সংস্থাটির মতে, তারা মুসলিম বিশ্বের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর হিসেবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি প্রচারের চেতনা নিয়ে মুসলিম বিশ্বের স্বার্থ ধারণ ও সুরক্ষায় কাজ করে। মূলত, মুসলিমদের ধর্মীয় স্থানগুলো শত্রুর কবলমুক্ত ও নিরাপদ রাখা এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্ব জোরদার করাই এর কাজ।

অথচ, মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংকট ফিলিস্তিন সংকটে কার্যকর কোন অবদান নেই সংস্থাটির। যেসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাব হটিয়ে বিশ্বরাজনীতিতে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছিল ওআইসি, বর্তমানে সংগঠনটির নেতৃত্বদানকারী দেশগুলোর বড় অংশই সেসব দেশের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যস্ত।

ফিলিস্তিন সংকটে ওআইসির ব্যর্থতাই প্রতীয়মান হয়েছে। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইনের মতো মুসলিম দেশগুলো ইসরাইলকে স্বীকৃতি প্রদানের ফলে ওআইসি ইসরাইলের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানে যেতে পারছে না। কারন, আরব দেশগুলোই এখন এই সংকট থেকে উত্তরনের কোন উপায়ে একতাবদ্ধ নয়। আজকে যদি ওআইসিভুক্ত দেশগুলো একত্রিত হয় এবং বিদ্রোহ করে, জাতিসংঘ থেকে একযোগে পদত্যাগের হুমকি দেয়, যদি এভাবে বারবার চলতে থাকে, যদি সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলে, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষে সকলে অবস্থান নেয় এবং সুদৃঢ় থাকে, যদি তারা নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য পরস্পর মিলে করার চেষ্টা করে, যদি তারা ইউরোর মতো নিজেদের মুদ্রা তৈরি করে; তাহলে নিশ্চয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডলারের প্রভাব থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার চিন্তা আদৌ কি আছে এই ক্ষমতাধরদের!

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই সংস্থার ভূমিকা তাই হতাশাজনক। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে একতাবদ্ধকরণে, অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ব্যর্থ এবং সর্বোপরি ফিলিস্তিন একটি মুসলিম দেশ হওয়ার পরেও বছরের পর বছর ধরে কুফরি বিশ্বের ষড়যন্ত্র আর বর্বরতার শিকার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওআইসি এসব নিষ্পেষনের প্রতিক্রিয়ায় 'গভীর উদ্বেগ প্রকাশ' ব্যতীত আর কিছুই করেনি।

ফিলিস্তিন সংকটে মুসলিমদের করণীয়

পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত আসন্ন সকল সমস্যার সমাধান সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। যুগে যুগে কি সমস্যা দেখা দিয়েছে তার আলোকে আমাদেরকে ভবিষ্যতের সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে, বিশেষত শেষ যামানায় কি কি ফিতনা দেখা দিবে এবং তা থেকে উত্তরণের পথ ও আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আমাদেরকে জানিয়েছেন। তো বর্তমান সময়ে আমরা কোন যুগে আছি এবং মুসলিম উম্মাহর বর্তমান সংকটের প্রেক্ষিতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ সংকট মোকাবিলায় মুসলিমদের করণীয় সম্পর্কে কিছু কথা পেশ করা হলোঃ

১। গুরুত্ব সহকারে দুয়া করাঃ

দুয়া মুমিনের হাতিয়ার। আমরা পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে আমাদের মজলুম মুসলিম ভাইবোনদের জন্য দুয়া করবো, জালিমদের দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনার জন্য দুয়া করবো। আল্লাহ যেন ফিলিস্তিনে মুসলিমদের সাহয্য করেন, খুব দ্রুত জালিমদের পরাজিত ক্রেন এবং আমাদেরকে যথাসাধ্য আন্তরিক থাকার তাউফিক দেন। নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য বিতরে দুয়ায়ে কুনুত তো পড়বো, কুনুতে নাজেলাও পড়বো ইনশা আল্লাহ। আর নিজেদের জন্য দুয়া করব আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে হকের পথে শামিল থাকার তাউফিক দেন, আমাদের অন্তর থেকে গায়রুল্লাহর ভয় দূর করে দেন, আমাদেরকে তাঁর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যশীল হিসেবে কবুল করে নেন।

২। নফল সালাত আদায়ঃ

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

'আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও।" (সূরা বাকারা আয়াত ৪৫)

আমাদের এখন প্রয়োজন আল্লাহর সাহায্যের জন্য বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করা। সালাতের মাধ্যম্নে আল্লাহর সাহায্য আসবে এটা আল্লাহরই ওয়াদা। তাই আমরা আমাদের ফরজগুলোর পাশাপাশি নফলেও মনোযোগী হবো এবং সিজদাতে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ।

৩। হাদীসে বর্তমান যুগ সম্পর্কে যা রয়েছে তা জানাঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদিসে এ পবিত্র ভূমি সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন। যখন একজন মুমিন জানতে পারে আজকের এ ঘটনাপ্রবাহ হাজার বছর আগে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর রাসূলের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন তখন আমাদের ঈমান শক্তিশালী হবে। তখন আমাদের মনে হতাশা, ভয়, বিস্ময় জাগবে না বরং ঈমান আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই এ সম্পর্কিত হাদীসের জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য সময়ের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত জরুরী।

৪। মুসলিম উম্মাহকে প্রস্তুত করাঃ

আমাদেরকে সাহসী এবং দৃঢ়চেতা হতে হবে। তালিবুল ইলম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো মুসলিমদের এ যুগের জন্য প্রস্তুত করা। আমাদের নিকটাত্মীয়, মাহরাম, কাছের মানুষ যাদের এ ব্যাপারে জানাশোনার স্বল্পতা আছে তাদেরকে সাধ্যানুযায়ী তারবিয়াত করতে পারি আমরা। এটাও আমদের ঈমানী দায়িত্ব কারণ এ দায়িত্বটুকুও পালন না করলে আল্লাহর দরবারে আমাদেরকে পাকড়াও হতে হবে।

৫। মসজিদুল আকসার সাথে অন্তর দিয়ে জুড়ে থাকাঃ

আমরা নিজেদের সমস্যা নিয়ে, নিজেদের মাথা বাঁচিয়ে রাখতে এতটাই ব্যস্ত যে ইসলামী বিশ্বের খবরাখবরের সাথে আমাদের কোন যোগসূত্র নেই। আমাদের এ ব্যাপারে কোন ফিকির নেই যে উম্মত কি অবস্থায় আছে, আমাদের প্রথম কিবলায় কি ঘটছে। আমরা কতজন এ ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ রেখেছি? কতজন মুনাজাতে কেঁদে আল্লাহর কাছে তাদের জন্য দুয়া করেছি! অথচ এ ভূমি হলো সেই স্থান যেখান থেকে আমাদের নবী(সাঃ) উর্ধ্বারোহণ করেছিলেন। এটাই সেই বরকতময় স্থান।

আমরা সামনাসামনি অংশ নিতে না পারি, অন্তত দুয়ার মাধ্যমে আমাদের মজলুম ভাইবোনদের সাথে থাকব ইনশা আল্লাহ। যেখানেই থাকিনা কেন, নিজেদের অন্তর কে মজজিদুল আকসার সাথে যুক্ত রাখতে চেষ্টা করবো।

৬। নারীদের আত্মত্যাগ ও কুরবানি প্রকাশ্যে আনাঃ

আমরা পুরুষদের ত্যাগ, সংগ্রাম প্রকাশ্যে দেখতে পাই কিন্তু নারীদের কুরবানী আড়ালেই রয়ে যায়। তাই তাদের আত্মত্যাগ দুনিয়াবাসীর কাছে গোপন থাকে। কিন্তু আসলে প্রতিটা দাওয়াতি মেহনত, যেকোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পেছনে, এর মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া কল্যানের পেছনে উদ্যমী, আনুগত্যশীলা নারীর ভূমিকাও থাকে। এ কথাগুলো প্রকাশ্যে আনা দরকার উম্মতের এ করুণ অবস্থায়। এতে অন্য অনেক নারীরাও অনুপ্রেরণা পাবে।

৭। আহলে হকের ব্যাপারে জ্ঞান রাখাঃ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের একটি দল সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করে গিয়েছেন যারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়পদ থাকবে, মাথা নত করবে না, তাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না, তারা সামান্য পরিমানেও টলে যাবে না, দর কষাকষি করবে না। আল্লাহর সাহায্য তাদের সাথেই থাকবে। তিনি এও বলেছেন যে, এ দলটি অবস্থান করবে বায়তুল মুকাদ্দাস ও এর আশেপাশের অঞ্চলে।

বর্তমান সময়ে আমাদের কাছে সেই দলটি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারা যেকোন মূল্যে মসজিদুল আকসার সম্মান রক্ষার্থে দৃঢ়পদ রয়েছে এবং পিছিয়ে যাচ্ছেনা।

৮। নিজেদের ঈমান মজবুত করা ও ইস্তিগফার করাঃ

ফিলিস্তিনীদের ঈমানের দৃঢ়তা, ঈমানের মজবুতি তে আল্লাহ বরকত দিন, তাদেরকে বিজয়ী করুন, তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন দুনিয়া ও আখিরাতে। আমাদেরকে নিজেদের ব্যক্তিগত

গুনাহর জন্য তওবা করতে হবে, সামাজিক কাপুরুষতা আর পরাজির মানসিকতার জন্য,নিজেদের মুনাফেকির জন্য তওবা করতে হবে এবং ইস্তিগফার করতে হবে।

৯। ফিলিস্তিনে চলমান এই জুলুম নিপীড়ন নিয়ে আলোচনা করাঃ

আমাদের মধ্যে অনেকেই আছি, আমরা নিয়মিত নামাজ পড়ি, কুরআন পড়ছি, ইসলামের বিধান সম্পর্কে আমরা অবহিত। কিন্তু কুরআনে আমাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাকওয়া অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে, সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধের কথা বলা হয়েছে, বীরত্বের কথা বলা হয়েছে সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা গাফেল। আমরা আমাদের উম্মাহর মজলুমদের ভুলে গিয়েছি তাদেরকে নিয়ে সামান্য আলোচনা পর্যন্ত করছিনা। বিশেষ করে নারীরা অনেকটাই অজ্ঞ এ ব্যাপারে। তাই ফিলিস্তিনের চলমান এ জুলুম নিপীড়ন নিয়ে আলোচনা করবো আমরা। তাহলে তাদের জন্য দুয়াটুকু অন্তত জারি থাকবে সবসময় আমাদের পক্ষ থেকে।

১০। ঈমানের সাথে আপোষ না করাঃ

ঈমানের ব্যাপারে কারো সাথে আপোষের মানসিকতা না রাখা এ শিক্ষাটা গ্রহণ করা আমাদের জন্য দরকার। ফিলিস্তিনের গত সাত দশকের পরিস্থিতি থেকে আমরা এটা শিখতে পারি যে ঈমানের প্রসঙ্গে মাথা নত করা যাবেনা। কিন্তু দুঃখজঙ্ক ব্যাপার এই যে, বিশ্বের আরব দেশগুলোর সবাই মিলেও এই হিম্মতটুকু রাখছে না ইসরাইলের বিপক্ষে। সকলে দেখেও না দেখে রয়েছে এই জুলুম, ধ্বংস আর হত্যাযজ্ঞ। কার্যকরী কোন পদক্ষেপ নেয়া তো নয়ই ,সামান্য বয়কটের হিম্মত ও করছেনা। মুসলিম বিশ্ব কেবলই নীরব দর্শক।

১১। যুবক সমাজকে বর্তমান সংকট সম্পর্কে অবহিতকরনঃ

আলেম সমাজের সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন এবং তার প্রয়োগ ঘটানো। এটি এখন যুগের দাবী। প্রত্যেক যুগের জ্ঞান ও বিষয়বস্তু থাকে ,সে অনুযায়ী বর্তমান সমইয়ের এ সংকটকে এবং এ সংকট থেকে উত্তরনের পথগুলো কুরআন-হাদিস থেকে আলোচনা করে যুবসমাজের প্রতি তুলে ধরা। আমরা বাস্তবতা থেকে, মুসলিম উম্মাহর পরিনতি নিয়ে ফিকির থেকে অনেক পিছিয়ে আছি, আমাদের প্রজন্মের এ ব্যাপারগুলোতে আরো বিস্তৃত জ্ঞান আর দিকনির্দেশনা প্রয়োজন।

১২। কুরআন শেখা ও শেখানোঃ

আমরা যদি সত্যিকারভাবে কুরআন বুঝতাম, আমাদের জীবনে কুরআনকে আকড়ে ধরে রাখতে পারতাম তাহলে আমাদের উম্মতের জন্য আরো সহজ হতো এ দুর্দশা কাটিয়ে উঠা। নিজেদের ঈমান, আখলাক, আমল আরো মজবুত হতো। এটা কুরআনের হক যে আমরা বুঝে পড়ব এবং কুরআনের শিক্ষা জীবনে প্রয়োগ করবো।

আর যারা কুরআন পড়তে পারি, বুঝতে পারি তারা অন্যদের জানাবো, শেখাবো। প্রতিদিন এক আয়াত হলেও আলোচনায় রাখবো ,অনুবাদ সহ পড়বো ও পড়াবো।

১৩। আর্থিক সহায়তাঃ

আমাদের বর্তমানে অন্যতম বড় একটি দায়িত্ব হলো নিজেদের খরচ কমিয়ে, ত্যাগ স্বীকার করে যার যে বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রয়েছে তার মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব ফিলিস্তিনী মুসলিমদের জন্য আর্থিক সহায়তা পাঠানো।

১৪। শিশুদের মধ্যে জিহাদ ও শহীদ হওয়ার আগ্রহ তৈরীর চেষ্টাঃ

এই সময়টাই হলো আমাদের নিজেদের সন্তানদের মননে ,মানসিকতায়, জেহেনকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করার উত্তম আর যথাযথ সময়। এতে উম্মাহর প্রতি দায়িত্ববোধ জন্মাবে আর ইসলামের খেদমতের জন্য পরবর্তী প্রজন্মের কর্মী পাওয়া যাবে।

১৫। নাহি আনিল মুনকার বিল লিসানঃ

মুখ দ্বারা অসৎ কাজে বাধা দেয়ার ফরজটুকু আদায় করা। সামাজিক মিডিয়া, ইউটিউব, গণমাধ্যমে লেখালেখির দ্বারা, বক্তৃতা দেয়ার মাধ্যমে, প্রেসক্লাব বা যেখানে সুযোগ-সুবিধা করা যায় সেখানে নিজের দক্ষতার মাধ্যমে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে সাহায্যের চেষ্টা করা উচিত।

১৬। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনঃ

ফিলিস্তিনে চলমান এই জুলুমের বিপপক্ষে মুসলিমদের একতাবদ্ধ হয়ে বৃহৎ পরিসরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হবে। এতে মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে বিশ্ববাসী জানবে, মুসলিমদের ঐক্য বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের ফিলিস্তিনী মুসলিম মজলুম ভাইবোনরাও আনন্দিত হবে। তারা জানবে আমরা তাদের পাশে আছি এটি তাদের সাহস, মনোবল বাড়াবে।

১৭। সামরিক প্রশিক্ষনঃ

মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এমন পদক্ষেপ নেয়া এখকন আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, প্রতিটি নাগরিককে সামরিক প্রশিক্ষন দেয়া হবে। মুসলিমদের উচিত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং জিহাদের কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে এমন প্রশিক্ষন গ্রহন করা। এ পদক্ষেপ মুসলিম দেশগুলোর সরকারকে গ্রহন করতে হবে।

১৮। কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নঃ

যেসব আরব দেশগুলো ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছে ও দূতাবাস খুলেছে তাদের কর্তব্য হল, সেই দূতাবাস বন্ধ করা এবং সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা। নিজ দেশের রাষ্ট্রদূতকে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং ইসরাইলি রাষ্ট্রদূতকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া। শুধু কূটনৈতিক ভাবেই নয়, বাণিজ্যিক লেনদেন ও সম্পুর্ণ ছিন্ন করা উচিত অবিলম্বে।

১৯। ইসরাইলি পণ্য বয়কটঃ

ইসরাইলি পণ্য বয়কট এখন সময়ের দাবী। শুধু মুসলিম দেশই নয় বরং অন্য দেশগুলোরও উচিত এ দেশের পণ্য বয়কট করতে শুরু করা এবং বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহন করা। এতে ইসরাইল আর্থিকভাবে বিরাট ধাক্কার সম্মুখীন হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সহ বিশ্বের আরো বহু মুসলিম

দেশ ইসরাইলি পণ্য বয়কট করতে শুরু করেছে ব্যাপক পরিসরে এবং ইতিমধ্যে এর প্রভাব ও দেখতে পেয়েছি আমরা। কয়েকটি দেশে ইসরাইলি বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

২০। আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগঃ

মুসলিম শাসক, ক্ষমতাসীন শ্রেণি, উম্মাহর সেনাবাহিনীসহ আরো যারা ক্ষমতার অধিকারী রয়েছে তাদের শুধুমাত্র সাহায্যসামগ্রী, আর্থিক সহায়তা বা নিন্দামূলক বিবৃতিগুলোয় সন্তুষ্ট না হয়ে এ জুলুমের স্থাইয়ী অবসানের জন্য একটি অর্থপূর্ণ জবাব দেয়া উচিত। এক্ষেত্রে সাধারন জনগনকে এই শক্তিশালী ব্যক্তিদের উপর চাপ প্রয়োগের সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। ইসলামী বিশ্বের এখন উন্নত সামরিক শক্তি রয়েছে, মিসাইল প্রযুক্তি রয়েছে। এ সকল ক্ষমতা ও শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে ইসরাইলের সাথে কথা বলতে হবে ও আন্তর্জাতিকভাবে চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

২১। আল্লাহর দ্বীনের বিজয় ও তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামঃ

আমাদের উম্মাহর সবচেয়ে বড় দূর্বলতা ও অপরাধ হলো ইসলামের প্রতি আনুগত্যশীল না হওয়া এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অগ্রগামী না হওয়া একে অবহেলা করা। বিশ্বে এতগুলো মুসলিম দেশ থাকা সত্বেও এই দায়িত্ব পালনের অভাবে উম্মাহ এ অপমানজনক অবস্থায় দিনানিপাত করছে। আমাদের দায়িত্ব আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা নিজ অবস্থান থেকে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আন্তরিকতার সাথে সর্বোচ্চ চেষ্টা করার তাউফিক দিন, আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন, মুসলিম উম্মাহকে দ্বীন রক্ষার স্বার্থে একত্রিত করুন, জালিমদের পরাস্ত করুন এবং আমাদেরকে বিজয়ী করুন।

উপসংহার

ফিলিস্তিনজুড়ে দখল-উচ্ছেদ, গণহত্যা আর বর্বরতা চলছে, দশকের পর দশক ধরে নিরীহ মুসলিমের কান্নায় সেখানকার বাতাস ক্রমেই ভারী হচ্ছে কিন্তু ঈমানী সম্পর্ক রক্ষার দাবী আর মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ আজ কোথায় হারিয়ে গেলো! পবিত্র ভূমিতে ইহুদীদের দখলদারিত্ব চলছে মানে হক-বাতিলের সর্বশেষ লড়াই আসন্ন। আর আমাদের সামনে এসেছে হকের পক্ষে দৃঢ়পদে অবস্থান করে, লড়াই করে নির্বাচিত উম্মতের যথার্থতা প্রমাণের সেই সময়। আল্লাহ তায়ালাই ইহুদি- নাসারাদের পরিবর্তে উম্মতে মুহাম্মাদির উপর এ বরকতময় ভূমির সংরক্ষন, পবিত্রতা আর মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব প্রদান করেছেন। তাই এ আমানত রক্ষা করা আমাদের ঈমানের পরীক্ষার কষ্টিপাথর।

আল্লাহর অকাট্য নীতি হল وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য শুভ পরিণাম নিশ্চিত এবং اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ আল্লাহর নেককার ও যোগ্য বান্দারাই এই যমীনের প্রকৃত মালিক।

এ যুগের ফিতনা হলো দাজ্জাল আর এ ফিতনার সমাপ্তিও ঘটবে ফিলিস্তিনেই। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন যারা এ ফিতনার বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন এবং আল্লাহর জমীনে তাঁর দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। আল্লাহ আমাদের জিহাদরত ভাইদের সাহায্য করুন, তাদের মাঝে সম্প্রীতি বজায় রাখুন, তাদেরকে একতাবদ্ধ থাকার তাওফীক দিন, বিজয়ের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল উপকরণ তাদের জন্য সহজ করে দিন, বাইতুল মাকদিস বিজয়ের পথ মসৃণ করে দিন।

তথ্যসূত্র

- ফিলিস্তিন সংকট ঐতিহাসিক পটভূমি, ভয়ংকর ভবিষ্যৎ ও আমাদের করণীয় — ডাঃ ইসরার আহমেদ রহঃ, মাওলানা সাজ্জাদ নুমানি।
- বায়তুল মাকদিস ও ফিলিস্তিনের ইতিহাস, ইয়াহুদিদের ষড়যন্ত্র — আবু লুবাবা শাহ মনসুর।
- মাসিক আল কাউসার আল কুদস সংখ্যা।
- বিবিসি নিউজ বাংলা।
- দৈনিক কালের কণ্ঠ।
- কালবেলা বাংলা নিউজ পেপার।
- দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ।
- ঢাকা পোস্ট ডট কম।